সময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ
রণধীর পাল
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য্য

মুদ্রাকর ঃ
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১ বি, রাজা লেন
কলিকাতা—৯

"রা-স্বা",

অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
সুহৃদরেষু

ভগবানের আবির্ভাব

ক্যানসারের ওষুধ যে প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা লোহিতাক্ষ নিজেই বুঝতে পারছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক কাঁপছিল, তেষ্টা পাচ্ছিল, হাত পা ঠাণ্ডা আর মাথা গরম হয়ে উঠছিল।

লোহিতাক্ষর সামনে একটা কাচের পাত্র বুনসেন বার্নারের ওপর বসানো। ভিতরে একটা সবুজ তরল টগবগ করে ফুটছে। সবুজ রংটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে মেরে এলে তিনি সেটা একটা পিউরিফায়ারের মধ্যে রাখবেন। একটা ফানেলের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ তরলটি একটি টেস্ট টিউবে এসে জমবে। তারপর আর মাত্র দুটো পর্যায় থাকবে। ক্যানসারগ্রস্ত একটা ইঁদুর খাঁচায় ধুঁকছে। তার ওপর প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ফলাফল কী হবে তা লোহিতাক্ষ জেনে গেছেন। তাঁর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা হল, কপালের বাঁ দিকে একটা আব। যখনই তিনি কোনো সাফল্যের কাছাকাছি আসেন তখনই ওই আবটার মধ্যে একটা কুড়কুড় শব্দ হয়। ঠিক যেন একটা পোকা আবের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুড়কুড় কুড়কুড় করে আনন্দে গান গায়।

লোহিতাক্ষর আবের মধ্যে পোকাটা এখন কুড়কুড় কুড়কুড় শব্দ করছে; লোহিতাক্ষ যখন সর্দিকাশির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন তখনও আবের মধ্যে এরকমই শব্দ হয়েছিল। আর সে কী ওষুধ! চারবার নাক ঝাড়লেই সর্দি সাফ। সেবার সর্দির ওষুধ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য অতএব দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজও তাঁর বাঁধা। আবের ওপর আদর করে একটু হাত বুলিয়ে নিলেন লোহিতাক্ষ!

এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বনমালী ঢুকল। বনমালী লোহিতাক্ষর কাজের লোক।

বাইরে দুজন লোক এয়েছেন।

এই সকালে আবার কে এল ?

তা কী জানি। একজন বেঁটে, অন্যজন লম্বা। ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে না। যান গিয়ে দেখুন।

ভাল লোক নয় কি করে বুঝলি ?

আপনিও বুঝবেন। আমি শুধু কয়েছিলুম যে, বাবু এখন কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না, তাইতে প্রায় মারতে এল।

ওঃ তাই বুঝি খারাপ লোক! তা কী চায় তারা ?

তা আর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। আপনার ভিজিটার আপনি গিয়ে সামাল দিন।

লোহিতাক্ষ সাধারণত উটকো লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। কিন্তু আজ তিনি নিজের সাফল্যের আনন্দে এত ডগমগ যে, বার্নারের তাপটা কমিয়ে উঠে পড়লেন, চল তো গিয়ে দেখি কেমন লোক!

লোহিতাক্ষর বাইরের ঘরে যে দুজন অপেক্ষা করছিল তারা সুবিধের লোক নয় তা এক নজরেই বোঝা যায়। বেঁটে লোকটা ভীষণ বেঁটে, পাঁচ ফুটের নিচেই হবে। আর তার চেহারা অনেকটা ফুটবলের মতো গোলাকার! লম্বা লোকটা আবার বিসদৃশ রকমের লম্বা এবং দৈত্যের মতোই তার স্বাস্থ্য। মিল একটা জায়গায়। দুজনের চোখই ভাঁটার মতো জ্বলন্ত। দেখলেই মনে হয়, এরা চোখের ইশারায় মানুষের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কোন দেশের লোক তাও বুঝবার উপায় নেই। গায়ের রত তামাটে উজ্জ্বল, মুখও ভাবলেশহীন, চুল কালো। সাহেব; বাঙালী, চীনে সবই হতে পারে।

কী চাই আপনাদের ?

বেঁটে লোকটা তার ভাঁটার মতো চোখ দুটোকে আর গনগনে

করে লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে থেকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, তুমিই জড়িবুটিওয়ালা লোহিতাক্ষ সেন ?

এ কথায় কার না রাগ হয় ? নোবেলজয়ী বৈজ্ঞানিক লোহিতাক্ষ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। তাঁকে প্রথম পরিচয়ে 'তুমি' করে সম্বোধন আর 'জড়িবুটিওয়ালা' বললে তো তাঁর ক্ষেপে যাওয়ারই কথা। লোহিতাক্ষও ক্ষেপলেন এবং দাঁত কড়মড় করে বললেন, তার মানে ? এটা কি ইয়ার্কির জায়গা ?

বেঁটে লোকটা একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে এক গাল কটু গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শান্ত হও। তুমি যে একটা মেডেল পেয়েছো তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, মেডেল! কিসের মেডেল ?

ওই যে নোবেল প্রাইজ না কি যেন! তা সে যাকগে, তুমি যে ভাল ছেলে তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপছিলেন বটে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতেও তিনি লক্ষ্য করলেন, বেঁটে লোকটার বাঁ কপালে একটা কালো রঙের জরুল। লোকটা মাঝে মাঝে জরুলটায় হাত দিচ্ছে।

লোহিতাক্ষ বললেন, আপনারা বেরিয়ে যান। আমার বাজে কথায় নষ্ট করার মতো সময় নেই।

বেঁটে লোকটা একটু গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, কেন, কী এমন রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত আছ হে ? অ্যাঁ!

বলেই লোহিতাক্ষর মুখে এক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে অপমানসূচক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। তারপর বলল, আগেকার লোকেরা ভক্তিশ্রদ্ধা জানত, আর এখনকার তোমরা! ছ্যা ছ্যা, একটু ভদ্রতাও জাননা দেখছি।

এ কথায় লোহিতাক্ষ লোকটাকে খুন করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রিভলবার নেই। কস্মিনকালেও ছিল না।

বেটে লোকটা কিন্তু লোহিতাক্ষের মনের কথা টের পেল এবং সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, খেলনাটা দাও তো।

দৈত্যটা একটা রিভলবার বের করে বেঁটের হাতে দিল। আর বেঁটেটা রিভলভারটা নিজের বুকের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ একটা শব্দ ও ধোঁয়ার ভিতরে বুলেটটা লোকটার বুকে লেগে ঠং করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

বেঁটে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, দেখলে তো! বিশ্বাস না হয় নিজেই চেষ্টা করে দেখ। এই নাও রিভলবার। জেনুইন জিনিস, সত্যিকারের গুলিই ভরা আছে।

বলতে বলতে রিভলবারটা এগিয়ে দিল লোকটা।

লোকটা সোফায় গা এগিয়ে বসে আর এক কুণ্ডলী ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আরে লজ্জা কী? চালাও না। আচ্ছা আনাড়ী রে বাবা!

লোহিতাক্ষ রিভলবারটা তুলে দুম করে গুলি করলেন। গুলিটা আগের বারের মতোই লোকটার বুকে লেগে ছিটকে পড়ল।

লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, কী বল হে মেডেল-পাওয়া কম্পাউণ্ডার, সুবিধে করতে পারলে? দাও খেলনাটা আমার হাতে দাও। আর শোনো, আমি হচ্ছি ভগবান। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই।

লোহিতাক্ষ রাগে গড়গড় করে বললেন, ভগবানই হোন আর যাই হোন আপনি অত্যন্ত অভদ্র।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। গা দুলিয়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে। তারপর বলল, ওরে বাপু, আমার নাম ভগবান নয়, আমিই স্বয়ং ভগবান। যাদের মূর্ত্তি টুর্ত্তি তোমরা পূজো করো তাদেরই একজন।

লোহিতাক্ষ নাস্তিক লোক। আর নাস্তিক বলেই তাঁর ভগভক্ত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই খুব ঝগড়া হয়। তাঁর স্ত্রী মোটেই তাঁর নাস্তিকতাকে ভাল চোখে দেখেন না।

লোহিতাক্ষ লোকটার দিকে চেয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, ভগবান তো একটা বোগাস ব্যাপার। আমি ওসব বিশ্বাস টিশ্বাস করি না। আর আপনাকেও আমার ভাল লোক মনে হচ্ছে না। আপনি থার্ড গ্রেড ম্যাজিসিয়ান মাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এখন আসুন। নমস্কার।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। তারপর বলল, বিশ্বাস করো না কি হে? জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছো চোখের সামনে। কত লোক আমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কত সাধ্য সাধনা করে।

আমার ইয়ার্কি করার সময় নেই। ল্যাবরেটরিতে আমি একটা জরুরী কাজ করছি। আপনারা আসতে পারেন।

বলতে বলতেই লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে দেখলেন, বেঁটে লোকটার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখা গেল, মেঝের ওপর পাতা বাঘছালে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন, ছাই মাখা শরীর, মাথায় জটাজুট, ধ্যান নিমীলিত চোখ, সারা গায়ে ফোঁস ফোঁস করে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোহিতাক্ষ তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে লাগলেন। ততক্ষণে শিবের বদলে ধনুর্ধর রামচন্দ্র দেখা দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই রামচন্দ্র গায়েব হয়ে বংশীধারী কৃষ্ণকে দেখা গেল।

বেঁটে লোকটা তেমনি গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, দেখলে তো! এবার প্রত্যয় হল?

লোহিতাক্ষ একটু কেমন যেন হয়ে গেলেন। ম্যাজিসিয়ানরা অনেক কৌশল জানে ঠিকই, কিন্তু এটা ম্যাজিক বলে তাঁর মনে হচ্ছিল না। একটু ধন্ধে পড়ে কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন।

এমন সময় অন্দরমহল থেকে তাঁর স্ত্রী একটা শাঁখ হাতে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন। তোমার যে মহাপাপ হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন আর তুমি তাঁকে গালমন্দ করছো? ওরে

বনমালী, শীগগীর জল বাতাসা আর ফুল নিয়ে আয় ধূপ দীপ জ্বাল…

বেঁটে লোকটা খুব ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগল। লোহিতাক্ষর স্ত্রী ধূপ দীপ জ্বেলে জল বাতাসা আর ফুল দিয়ে ঘণ্টা নেড়ে যাবতীয় স্তবস্তুতি আউড়ে যেতে লাগলেন। লোহিতাক্ষ বেকুবের মতো চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পূজো হয়ে গেলে লোহিতাক্ষকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে গিন্নী বললেন, হলটা কী তোমার? প্রণাম করো।

লোহিতাক্ষ অগত্যা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটা প্রণামও করে ফেললেন।

বেঁটে লোকটা খুব খুশি হয়ে বলল, লোহিতাক্ষ গাড়ল হলেও বউমাটি ভারী লক্ষ্মীমন্ত। তা তোমরা বরটর চাইবে না?

বরের কথায় কর্তা-গিন্নি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

লোকটা একটু হেসে বললেন, আরে লজ্জা কিসের? চেয়ে ফেল, চেয়ে ফেল, আমার আর বিশেষ সময় নেই।

গিন্নি ধরা গলায় বললেন, আমি আর কী চাইব বাবা? স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে থাকতে পারি…

তথাস্তু।

লোহিতাক্ষ করুণ গলায় বললেন, দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজটি…

তথাস্তু।

এই বলে ভগবান উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বললেন, তবে বাপু, আমারও কিছু চাওয়ার আছে। ওই যে কী একটা ওষুধ বানাচ্ছো, ওটা আর বানিও না, একটা দুটো দুরারোগ্য রোগ আছে বলেই মানুষ এখনো ভগবানের ডাক খোঁজ করে। রোগ ভোগ লোপাট হয়ে গেলে সেটুকুর পাটও উঠে যাবে। তুমি বরং একটা দাদের মলম বা আমাশার ওষুধ বানাও, তাতেই নোবেল পেয়ে যাবে। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু···

আর কিন্তু নয়। এখনই গিয়ে সব ফর্মুলা নষ্ট করে দাও গে। শুভস্য শীঘ্রম।

ওকে যেতে হবে না ঠাকুর, আমিই গিয়ে সব নর্দ্দমায় ফেলে দিয়ে আসছি। বলে গিন্নিই উঠে গেলেন।

বেঁটে লোকটা একটা বাতাসা মুখে পুরে উঠে পড়ল, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বলল, চলি হে। অনেকটা দূর যেতে হবে। যাওয়ার আগে আসল কথাটা বলে যাই। আমি ভগবান টগবান নই। তবে গ্রহান্তরের মানুষ। পৃথিবীতে অনেকদিন ধরেই আমাদের আনাগোনা। বাঁদর থেকে তোমাদের মানুষ বানিয়েছি আমরাই। বিজ্ঞানে তালিম দিয়েছি, চাকা বানানো থেকে অ্যাটম বোমা তৈরি অবধি সব ব্যাপারেই আমাদের অদৃশ্য হাত ছিল। আর এ সব যা দেখালুম তোমায় সবই বুজরুকি বটে, তবে আসল ভগবানও একজন আছেন। কিন্তু তত দূরে তোমাদের ধারণা পৌঁছোয় না বলে এই আমাদেরই তোমরা এতকাল ভগবান ভেবে পুজো আচ্চা করে এসেছো···

লোহিতাক্ষ লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাঁ! তাহলে আমার দ্বিতীয় নোবেলের কী হবে?

তার আমি কী জানি, আমার বর ফলে কিনা তা আমি জানি না।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? ঠিক আছে ফরমুলা আমার মুখস্থ। আমি ক্যানসারের ওষুধ আবার বের করে ফেলব।

লোকটা মাথা নাড়ল, না বের করবে না। বের করলে কী হবে জানো?

কী হবে?

তুমি যে রোজ চুষিকাঠি ছাড়া ঘুমোতে পারো না সে কথা সবাইকে জানিয়ে দেবো।

কথাটা ঠিক। লোহিতাক্ষ এতবড় বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্বেও বাচ্চা ছেলেব মতো একটা স্বভাব আছে তাঁর। এখনও চুষিকাঠি ছাড়া তিনি ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু সে কথা বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানে না।

লোহিতাক্ষ স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললেন, যে আজ্ঞে।

লোক দুটো বেরিয়ে গেল।

রামবাবু এবং কানাই কুণ্ডু

রামবাবুর খুব সর্দি হয়েছিল। বন্ধু শ্যাম কবিরাজ তাঁকে এক পুরিয়া কবরেজি নস্যি দিয়ে বললেন, শোওয়ার আগে এক টিপ টেনে শুয়ে পোড়ো।

তাই করলেন রামবাবু। ঘুম ভেঙে উঠে সকালে বেশ ঝরঝরে লাগল শরীরটা।

সকালবেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে রামবাবু আয়নায় আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর বাঁ গালে একটা কালো এবং বড় জরুল দেখা দিয়েছে। প্রথমটায় ভেবেছিলেন কালির দাগ। আঙুল দিয়ে ঘষে দেখলেন, তা নয়, জরুলই। তবে আচমকা গালে একটা জরুল দেখে রামবাবুর যতটা বিরক্ত বা বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল ততটা হলেন না। কারণ, জরুলটা তাঁর ফর্সা গালে মানিয়েছে ভাল।

ফর্সা! রামবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে আবার একবার থমকালেন, ফর্সা? তিনি তো কস্মিনকালেও ফর্সা নন। বেশ কালোই তাঁর গায়ের রঙ। তাহলে এরকম ধপধপে ফর্সাই বা তাঁকে লাগছে কেন এখন? রামবাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফটফটে আলোয় হাত-আয়না দিয়ে মুখখানা দেখলেন। নাঃ, দারুণ ফর্সাই তো তিনি! লোকে যে এতকাল কেন তাঁকে কালো বলে বদনাম দিয়ে এসেছে!

যাকগে রামবাবু আজ বেশ খোশমেজাজেই দাড়ি কামিয়ে চান সেরে নিলেন। মাথা জোড়া টাক বলে রামবাবুকে চুল আঁচড়ানোর বিশেষ ঝক্কি পোয়াতে হয় না। ঘাড় আর জুলপি আঁচড়ে নিলেই চলে।

কিন্তু আজ রামবাবু চুল সামলাতে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেলেন। মাথা ভর্তি কালো কুচকুচে এবং ঢেউ খেলানো চুল যে

কোথা থেকে এল তা রামবাবু হদিস করতে পারলেন না কিন্তু অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো ফুরসৎ হাতে নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই রামবাবু একটা হাঁক মারলেন, গিন্নী, খেতে দাও। তারপর চটপট পোশাক পরে ফেললেন।

তাঁর গিন্নী বেশ মোটাসোটা, একটু থপথপে, গম্ভীর প্রকৃতির। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি রামবাবুর দিকে তাঁর গম্ভীর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আপনি বাইরের ঘরে গিয়ে বসুন। উনি বাথরুমে গেছেন।

এটা কি রকম রসিকতা তা রামবাবু বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর গিন্নী খুব রসিক প্রকৃতির মানুষও নন।

রামবাবুকে খুব একটা বোকা বলা যায় না, তিনি একটু ভাবলেন এবং ফের বড় আয়নায় ভাল করে নিজেকে দেখলেন। বছর পঁচিশেক বয়সের বেশ কার্ত্তিক ঠাকুরের মতো চেহারাবিশিষ্ট এই লোকটা যে তিনি নন তা টের পেতে আর এক লহমাও দেরী হল না তাঁর।

প্রথমটায় একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও শেষ অবধি খুশিই হলেন রামবাবু। টাকওলা, কালো এবং নাদুস নুদুস চেহারার যে মানুষটি তিনি ছিলেন তাকে তাঁর বিশেষ পছন্দ ছিল না।

রামবাবু এটাও বুঝলেন যে এ বাড়িতে আর অবস্থান করা ঠিক হবে না। তিনি আর যেই হোন রামবাবু নন।

সুতরাং রামবাবু সদর খুলে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে পড়লেন।

সমস্যা হল তিনি যে রামবাবু নন এটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু তাহলে তিনি কে? এই নতুন চেহারার লোকটার তো একটা কোনও পরিচয় আছে! গোবর্ধন, রাজবল্লভ, বগলাপতি বা যাই হোক একটা নাম এবং পাল, সিংহ, ভট্টাচার্য যা হোক একটা পদবী তো তাঁর থাকা উচিত।

বড় রাস্তায় পড়ার আগে দেখলেন গলির মোড়ে রক-এ বসে ছেলেরা আড্ডা মারছে। তাঁরই ছেলের বন্ধুরা সব।

রামবাবু যখন তাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ তারা কথাবার্তা বন্ধ করে তাঁর দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ফিসফাস করতে শুরু করল, ওরে, ওই দ্যাখ কানাই কুণ্ডু যাচ্ছে।

কানাই কুণ্ডু! রামবাবু একটু চমকালেন, কানাই কুণ্ডু মানে কি মোহনবাগানের সেই বিখ্যাত খেলোয়াড়টি নাকি? না, তার খেলা রামবাবু কখনো দেখেননি তবে নামটা প্রায়ই শোনেন। দারুণ নাকি ভাল খেলে। রোজই একটা দুটো তিনটে করে গোল দেয় বিপক্ষ দলকে। তাহলে তিনিই কানাই কুণ্ডু?

রক-এর ছেলেরা হঠাৎ দৌড়ে এসে তাঁকে প্রায় ঘিরে ফেলল।

এই যে কানাইদা; এখানে কোথায় এসেছিলেন?

কানাইদা, আপনি তো বাগবাজারে থাকেন। আপনার ঠিকানাও জানি। ওয়ান বাই সি, বাগবাজার লেন।

কানাইদা, আজ ইস্টবেঙ্গলকে ক গোল দিচ্ছেন?

একটা অটোগ্রাফ দেবেন কানাইদা?

রামবাবু খুব উঁচু দরের হাসি হেসে সবাইকার সঙ্গেই একটু আধটু কথা বললেন; এই ফাঁকে নিজের একটু পাবলিসিটিও করে নিলেন। বললেন, এই পাড়ায় রামবাবুর কাছে এসেছিলাম। উনি আমার দাদার মতো।

একটা ছেলে বলে উঠল, ধুস, রামবাবু তো কুমড়ো-পটাশ তার ওপর হাড়-কেপ্পন। একটু ছিটও আছে মাথায়।

রামবাবু আমতা আমতা করে বললেন, তোমরা ওঁকে ঠিক চেনো না। ও রকম সদাশিব লোক হয় না।

যাই হোক, রামবাবু ছেলেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ট্যাকসি ধরলেন।

কোথায় যাবেন তা সঠিক জানেন না। ওয়ান বাই সি বাগবাজার লেন-এ কানাই কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হতে তাঁর ঠিক সাহস হল না। সেখানে আবার কী গুবলেট হয়ে আছে কে জানে!

তবে তিনি এটা জেনে নিয়েছেন যে, ময়দানে আজ মোহনবাগানের

সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ আছে। কাজেই ট্যাক্সিটা তিনি ময়দানের কাছে এনে ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়লেন।

আর নেমেই পড়ে গেলেন বিপাকে। কোত্থেকে পিলপিল করে একগাদা লোক ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল।

এই কানাই, খুব ল্যাং মেরে খেলা শিখেছো! অ্যাঁ, সেদিন যে বড় আমাদের হাফ ব্যাকটাকে জখম করেছিলে! আজ তোমার ঠ্যাং খুলে নেবো।

কানাইয়ের খুব তেল হয়েছে রে কালু। আয় আজ ওর তেল একটু নিংড়ে নেওয়া যাক!

এই যে কানাইবাবু, বল না প্লেয়ার কাকে লাথি মারতে আপনার বেশি ভাল লাগে বলুন তো! চোখে ভাল দেখতে পান তো।

'ওহে কানাই মস্তান' আজ ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে কিন্তু কলজে খেঁচে নেবো, বুঝলে?

এই সময়ে কিছু লোক দৌড়ে এসে রামবাবুকে ধরে বলল, এই যে কানাই, আজ এত বড় খেলা, আর তোমার পাত্তাই নেই! চলো চলো টেণ্টে চলো।

রামবাবু বুঝলেন এরা সব ক্লাবের কর্মকর্তা। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কর্তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে টেণ্টে ঢুকিয়ে দিল।

টেণ্টের ভিতরে তখন প্লেয়াররা গম্ভীর মুখে বসে কোচের উপদেশ শুনছে। রামবাবুও শুনতে লাগলেন। তবে কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি জীবনে কখনও ফুটবল খেলেননি। একটু আধটু হাডু-ডু খেলেছেন, অল্পস্বল্প ডাংগুলি। তার বেশি কিছু নয়।

কোচ রামবাবুকে বললেন, কানাই, তুমি একদম পাংচুয়াল নও। বি সিরিয়াস। সত্যেন তোমাকে বল ঠেললে তুমি ওয়াল পাস খেলবে কালিদাসের সঙ্গে, তারপর ডায়াগোনালি···।

রামবাবু বুঝলেন না। তবে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

দুপুরে বেশ ভাল খাওয়া দাওয়া হল। তারপর বিশ্রাম। তারপর সবাই উঠে বুটটুট পরতে লাগল। রামবাবুর খুব একটা অসুবিধে হল না। আড়চোখে অন্যেরটা দেখে দেখে তিনিও বুট এবং জার্সি পরে ফেললেন।

মাঠে নামতেই রামবাবুর বুক এবং পা কাঁপতে লাগল। চারদিকে গ্যালারি ভর্তি হাজার হাজার লোক বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। রামবাবুর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মাঠে নেমে কী করতে হবে তা তিনি বেবাক ভুলে গেলেন।

তবে একটা ব্যাপার তাঁর জানা আছে। মাঠের শেষে ওই যে জাল লাগানো তিনটে কাঠি ওর মধ্যে বল পাঠানোই হল আসল কাজ।

প্রথম কিছুক্ষণ রামবাবু বেমক্কা ছোটাছুটি করলেন। তারপর পায়ে একবার বল পেয়েই ছুটতে শুরু করলেন প্রাণপণে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে কেউ আটকাতে পারছিল না। রামবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে আরও জোরে ছুটে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে গিয়ে তিন কাঠির সামনে হাজির হলেন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে বলটা পাঠিয়ে দিলেন গোলের ভিতরে।

সমস্ত মাঠ হর্ষধ্বনি আর চিৎকারে ফেটে পড়ল।

রামবাবু এক গাল হাসলেন। একেই বলে খেলা।

কিন্তু চেয়ে দেখলেন তাঁর দলের খেলোয়াড়রা কেমন অদ্ভুত চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। গ্যালারি থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বলছে, ও ব্যাটা ঘুষ খেয়েছে। বের করে দাও মাঠ থেকে।

রামবাবু একটু ভড়কে গেলেন। এবং খানিক বাদে বুঝতে পারলেন, গোল তিনি দিয়েছেন ঠিকই তবে নিজের দলকেই। তাঁর দেওয়া গোলে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে পড়েছে।

কোচ মাঠের মধ্যে ঢুকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, বেরিয়ে এসো।

রামবাবু বেরিয়ে এলেন। আর তারপরই পটাপট কিল, চড়

চাপড় কিল ঘুঁসি এসে পড়তে লাগল তাঁর ওপর। কে একটা ল্যাং ও যেন মারল।

রামবাবু মাটিতে পড়ে চোখ উল্টে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন।

আর তখনই বোঝা গেল, লোকটা রামবাবু। কানাই কুণ্ডু নয়।

আসল কানাই কুণ্ডু মামাবাড়ি গিয়েছিল কাঁঠাল খেতে। সবে ফিরেছে। বুটটুট পরে সে মাঠে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

পরদিন সকালে যখন দাড়ি কামাতে গেলেন রামবাবু তখন তাঁর কালো গালে জঙ্গল ছিল না। মাথা জোড়া টাক, থলথলে শরীর। তবু রামবাবু নিজেকে দেখে বেশ খুশিই হলেন।

ভূতের ভবিষ্যৎ

বাসবনলিনী দেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল-কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যে-সব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু' হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড় কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পাল্টাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমত বুড়ো। তবে নাতিদের নাতির আছে, তস্য পুত্র-কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে "নাড়ু খাব, নাড়ু খাব" বলে জ্বালিয়ে

মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড় ছেলের ছোট ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ ছেলে, বা কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কমপিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হবি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন। কাজেই, অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোন্‌টা খেতে ভালবাসে, কোন্‌টা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কমপিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, "মা, নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব ?"

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষেব নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, "তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম খোপে রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি !"

"ভুল হয়ে গেছে মা।"

"অত ভুল হলে চলে কী করে ? দেখছিস তো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি, দে তো একটা"

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তাব গন্ধ শুঁকে বললেন, "খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।"

"আচ্ছা মা।" বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক্ করে একটু কাসির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, "আবার এ-ঘরে ছোঁকছোঁক করছ কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন?"

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার-পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ্ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বললেন, "ছোঁকছোঁক করি কি আর সাধে? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার-মার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউণ্টারটা আজ আবার বন্ধ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।"

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, "ওরে, বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।"

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু'খানা দু'গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, "তোমার হাতের কলায়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?"

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন, "ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস?"

"যাই মা।" বলে সাড়া দিয়ে একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, "বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি!"

"খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।"

"তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভাল করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।"

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।"

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও?"

"কেন কী হয়েছে?"

"সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারী ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-মস্ত হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।"

"তাই যাও। কিন্তু সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব?"

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, "এবার অটোবড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভাল করে দে। যেন বেশ ডুমো হয়!"

"দিচ্ছি মা।"

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাজ্ঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের

একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাঁচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি-বেলুন দিব্যি গড়গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল-পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশ গুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি-বেলুনে একটা পাহারাদার কমপিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমতো ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপর-নীচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানালার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাব্‌ল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাব্‌ল বা বুদ্বুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের

খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।

বুদ্ধুদবন্দী হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে। কিন্তু হাঁটতে ভালবাসেন বলে বাসবনলিনী কদাচিৎ গাড়ি নেন।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোট ছোট ট্যাবলেট যা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনও ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলে জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দমতো আলু-কুমড়ো-পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকারই হয় না। শূন্যেই নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা-থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল-ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনও বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোট-ছোট ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে

দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনও অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারাজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য-পানীয়ের একখানা ছোট আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই-চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদ্ধদেসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড় বড় উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনও পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে-নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে কেউ-কেউ। হাওয়াই-বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওলার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি-বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, "কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?"

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভশ্চাযের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম জাম কাঁঠাল কিচ্ছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও

করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটের কোনও অসুবিধেই হত না। এই বড়ি-বেলুনে রোদে-দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড় কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, "আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব'খন।"

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।"

"কেন রে, কী হল?"

"আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিওতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারী বেয়াড়াপানা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।"

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলিস কী! এ তো সব্বোনেশে কাণ্ড।"

রেমো একটু হেসে বলল, "তোমরা পুরনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ-যুগের কোনও খবরই রাখো না। তবে ভালর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার-দাবারে বিষটিসও মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।"

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, "তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়ারা খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।"

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, "তুমি সত্যিই আদ্যিকালের

বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কব্জায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতিভাই, তলায় তলায় সকলের সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যাণ্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনোনি?"

"না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।"

"যাই ঠাকুমা, মা-বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।"

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখানে বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অকসিজেন-রুমাল মাঝে-মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই-জুতো পরিয়ে আকাশের ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা, যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট-কাজের-লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট-ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরি অলারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট-ডাক্তার, রোবট-নার্স। বাসবনলিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজী গলায় বলছিলেন,

“ফের কভি বিড়ি ফুকেগা তো কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় দেগা যে, আক্কেল একদম গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস?”

গঙ্গারাম একটু বোকাগোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনও নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, “শোনো, এখন চাকর-বাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পাল্টে গেছে।”

আশুবাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, “কিন্তু আস্পদ্দা ছ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?”

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, “আঃ, আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?”

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, “শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আশকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যাণ্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।”

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, “সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?”

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, “অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।”

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, “কী ওষুধ?”

আশুবাবু খুব হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, “আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।”

"বলো কী! চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।"

"দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।"

"না গো না, বিশ্বাস করেই ছাখো।"

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, "বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ভয়-টয় পেতে পারো।"

"জিনিসটা কী?"

"দেখলেই বুঝবে।"

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, "ওঁ ফট, ওঁ ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়!..." ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে?"

আশুবাবু হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, "এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু লোকটা আসলে কে?"

এ-কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো-করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, "এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত। একেবারে

নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করছিলুম, হচ্ছিল না। তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।"

শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু একখানা তালপাতাব পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, "আর ভয় নেই গিন্নি, ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদেরও টিট করবে ওরাই।"

কেলে ভূতটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, "এজ্ঞে, এক্কেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব মাঠান, কোনও চিন্তা করবেন না।"

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেঁচে থাকো বাবাবা।"

ভুসুক পণ্ডিত

ভুসুকু পণ্ডিত ভারী অলস। পাঠশালায় পড়াতে পড়াতে ছেলেদের টাস্‌ক করতে দিয়ে প্রায় সময়েই ঘুমিয়ে পড়েন। আর ছেলেরাও সেই সুযোগে দেদার ফাঁকি দেয়।

সময়টা ২০৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের সকাল। ভুসুক পণ্ডিত ছেলেদের একটা রচনা লিখতে দিলেন, বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ? তারপর ঘুমোতে লাগলেন।

পাঠশালা বসে একটা প্রকাণ্ড শিমূল গাছের তলায়। নিয়ম হয়েছে সেই আগেকার দিনের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাই এই ব্যবস্থা। ভুসুক পণ্ডিত বসেন গাছ-তলায় উঁচু একটা বেদীতে। ছেলেরা বসে ঘাসের ওপর মাদুর পেতে।

ভুসুকু পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়েছেন টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা নিজেদের কাজ শুরু করে দিল। একটি ছেলে পকেট থেকে ছোট্ট একটা লেসার রশ্মির পিস্তল বের করে টুক টাক ফল পাড়তে লাগল। একজন পকেট কমপিউটারের সঙ্গে খেলতে বসে দাবা। জনা তিনেক একটা হাত ঘড়ির সাইজের টেলিভিশনে চুপিচুপি অ্যাডভেনচারের ফিলম দেখতে লাগল। একজন অ্যান্টিগ্রাভিটি সাইকেলে উঠে আকাশে চক্কর দিতে থাকল। একজন দুষ্টু ছেলে আর এক-জনকে ডেকে বলল, অ্যাই, আজ চল পণ্ডিতমশায়ের টিকি কেটে দিই।

দ্বিতীয় ছেলেটা চোখ গোল করে বলে ওঠে, ওরে বাবা! টের পেলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

কথাটা ঠিক। ভুসুকু পণ্ডিতের চেহারাটা এমনিতে নাদুস নুদুস। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা, কাঁধের ওপর একটা উড়ুনি। পৈতেটা

ধপধপ করছে সাদা। নিষ্ঠাবান মানুষ। চেহারাটা নিরীহ হলে কী হয় ভুসুকু পণ্ডিত সাঙ্ঘাতিক রাগী লোক।

দুষ্টু ছেলেটা বলল, টের পেলে তো!

দ্বিতীয় জন ভয়ে ভয়ে বলে পারবি?

খুব পারব। এই বলে ছেলেটা পকেট থেকে একটা ক্ষুদে ওয়াকি টকি বের করে অন্য সব ছেলেদের উদ্দেশ্যে ফিস ফিস করে বলতে লাগল, বন্ধুগণ, আজ ভুসুকু পণ্ডিত মশাইয়ের শিখা কর্তন করা হইবে। তোমরা কেহ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিবে না যে, অপকর্মটি কে করিয়াছে। কেহ যদি প্রকাশ কর তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

অন্য সব ছেলেরা তাদের গলার কাছে বাঁধা ট্রানসরিসিভার যন্ত্রে ঘোষণাটা শুনতে পেয়ে ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করল না।

দুষ্টু ছেলেটা তার ব্যাগ থেকে একটা সোনার রেনজ বের করল। যন্ত্রটা দিয়ে ইচ্ছামতো নানা রকম শব্দ বের করা যায়, মাইক্রো ফিলমের মতো এর ভিতরে আছে একটি প্রি-রেকর্ডেড মাইক্রো ক্যাসেট রেকর্ডার। ছেলেটা একটা বোতাম টিপে যন্ত্রটা চালু করল। তারপর একটা পিস্তলের নলের মতো ব্যারেল লাগিয়ে সেটা তাক করল ভুসুকু পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে।

ব্যাপারটা হল, এই শব্দটা আসলে ঘুমপাড়ানি শব্দ। যার দিকে তাক করে শব্দটা নিক্ষেপ করা হবে সে ছাড়া আর কেউ তা শুনতে পাবেনা। অবশ্য কানে শোনার শব্দও এটা নয়। এটা হল এক-ধরনের কাঁপন বা ভাইব্রেশন, যা আধ মিনিটের মধ্যে যে কোনো লোককে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

দুষ্টু ছেলেটা পুরো এক মিনিট শব্দ চালালো। তারপর আস্তে আস্তে উঠল। প্রত্যেকে দুরু দুরু বুকে চেয়ে আছে দুঃসাহসী ছেলেটার দিকে। যন্ত্রের প্রভাবে পণ্ডিতমশাই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছেন বটে, কিন্তু একসময়ে তো জাগবেন! তখন যে কী কুরুক্ষেত্রটাই হবে!

ছেলেটা পকেট থেকে একটা ধারালো কাঁচি বের করে পণ্ডিত-মশাইয়ের পেছনে গিয়ে কুচ করে টিকিটা কেটে এক দৌড়ে পালিয়ে এল নিজের জায়গায়। পাঠশালায় এক চাপা হাসির হররা বেরিয়ে গেল।

সেই শব্দেই কিনা কে জানে, আচমকা পণ্ডিতমশাই চোখ মেলে চাইলেন।

ছেলেরা তো ভয়ে কাঠ। শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে সব। একটু অবাকও হয়েছে তারা। ভাইব্রেটার দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে পণ্ডিতমশাইকে, এত সহজে তো তাঁর জাগবার কথা নয়!

ভুস্মুকু পণ্ডিতমশাই চোখ চেয়েই বিশাল একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন হঠাৎ। ছেলেরা স্তম্ভিত। তারা এখনো পণ্ডিতমশাইকে হাসতে দেখেনি।

কিন্তু তাদের আরো স্তম্ভিত করে দিয়ে পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, আজ তোমাদের ছুটি! ছুটি!

ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠল, ছুটি পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, কিসের লেখাপড়া হ্যা? অ্যাঁ? লেখাপড়া অত কিসের? বাচ্চা ছেলেরা নাচবে, গাইবে, দুষ্টুমি করবে, তবে না। ওঠো সব, উঠে পড়ো? আজ আমাদের গান হবে। নাচ হবে। হুল্লোড় হবে।

বলেন কি পণ্ডিতমশাই? ছেলেদের চোখের ভাব ক্রমশ আরো গোল হয়ে উঠছে।

ভুস্মুকু পণ্ডিত হঠাৎ নিজেই তড়াক করে বেদী থেকে নেমে পড়লেন। তারপর দুহাত তুলে গান ধরলেন, আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি—গাও! গাও!

ছেলেরাও গাইতে লাগল।

ভুস্মুকু পণ্ডিত নাচতে নাচতে বললেন, শুধু গাইলেই হবে না, নাচো! সবাই নাচতে শুরু করো! তা ছেলেদের পোয়াবারো।

রচনা ছেড়ে নাচগান? একি ভাবা যায়! তারা সবাই পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে নাচতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ নাচগান হওয়ার পর ভুস্মুকু পণ্ডিতমশাই বললেন শুধু নাচ গান নয়। চলো সবাই মিলে একটু দুষ্টুমি করা যাক। চলো সনাতন মুৎসুদ্দির বাগান থেকে পেয়ারা চুরি করি।

ছেলেরা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, বলেন কি পণ্ডিতমশাই?

কিন্তু ভুস্মুকুর যেই কথা সেই কাজ। তিনি সবার আগে গিয়ে সনাতন বাগানের বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের বেড়াটিকে এক জায়গায় কেটে ফাঁক করে ঢোকার রাস্তা বানালেন। তারপর বাগানে ঢুকে নিজেই ঢিল মেরে এবং একটি ছেলের কাছ থেকে লেসার গান চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে মেলা পেয়ারা পেড়ে ফেললেন। সনাতনের রোবট চাকরগুলো তেড়ে আসায় পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে পালিয়ে এলেন। তারপর বললেন, চলো, একটু ফুটবল খেলা যাক।

ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না। পড়াশুনা ছেড়ে এরকম মজার সময় কাটানো মহা ভাগ্যের ব্যাপার। পণ্ডিতমশাই নিজে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে নেমে পড়লেন। বিস্তর আছাড় খেলেন বটে, কিন্তু খেললেনও চমৎকার। দুটো দারুণ গোল করলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের এত বিদ্যের কথা কেউ জানতো না।

খেলার শেষে পণ্ডিতমশাই বললেন, ওহে, চল পুকুরে স্নান করতে নামি।

ছেলেরা এই প্রস্তাবে হৈ হৈ করে উঠল। কাছেই চমৎকার বাঁধানো পুকুর। পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। তুমুল আনন্দে সবাই স্নান করতে লাগল।

কিন্তু আচমকাই তাদের আনন্দের মধ্যে একটা বজ্র এসে পড়ল যেন। আকাশ থেকে একটা ছোট্ট নৌকোর সাইজের রকেট নেমে এল। তা থেকে গম্ভীর চেহারার একজন লোক নেমে এসে পণ্ডিতমশাইকে একটা ধমক দিয়ে বলল, 'শীগগীর উঠে আসুন।'

ভূস্যূক পণ্ডিত যেন একটু ভয় পেয়েই জল থেকে উঠলেন। সঙ্গে ছে লরাও।

লোকটা ভূস্যূক পণ্ডিতমশাইকে ভাল করে লক্ষ্য করল, ঘুরে ফিরে দেখল, তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, এর অ্যানটেনাটা কে কেটেছে?

ছেলেরা অবাক হয়ে চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে।

লোকটা বলল, দুষ্টু ছেলে! ছিঃ।

এই বলে সকলের চোখের সামনে লোকটা একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের মাথার খুলিটা ফাঁক করে ফেলল, তারপর একটা নতুন টিকি বসিয়ে দিয়ে মাথাটা আবার জুড়ে দিয়ে বলল, 'এঃ! এই কমপিউটারটার একটা পাটশ খারাপ ছিল? কেউ লক্ষ্যই করিনি, টিকিটা কাটায় ভালই হয়েছে। যাও, এবার আর পণ্ডিতমশাই ঘুমোবেন না।'

টিকিটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ভূস্যূক পণ্ডিতমশাই আবার গম্ভীর ও রাগী হয়ে গেলেন। গাছতলার পাঠশালায় ছেলেদের জড়ো করে গমগমে গলায় বললেন, এবার আঁকের খাতা খোলো সব। করো তো, একসারসাইজ ষোলোর এক থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত আঁক-গুলো।

ছেলেরা প্রাণ ভয়ে আঁক কষতে লাগল। কারণ ভূস্যূক পণ্ডিতের চোখে ঘুমের লেশমাত্র আর নেই। দুই চোখ ভাঁটার মতো চারদিকে ঘুরছে।

রুমাল

২১৮২ খ্রীষ্টাব্দের এক সকালে বৈজ্ঞানিক হলধর বসু তাঁর পটাশপুরের ল্যাবরেটরিতে একটা পারমাণবিক চুল্লির উপর বাটি বসিয়ে বাসি ডাল গরম করছিলেন। পান্তা ভাত আর বাসি ডাল তাঁর ভীষণ প্রিয়, বাটিটা নামিয়ে ফ্রিজ থেকে পান্তাভাত বের করে খেতে বসবেন এমন সময় টাইম-টেলিফোনটা বেজে উঠল, ভারী বিরক্ত হয়ে তিনি উঠে টেলিফোনটা তুলে বললেন, "কে ?"

ওপাশ থেকে বন্ধু গদাধরের গলা পাওয়া গেল, "হলধরভায়া নাকি ? আমি গদাধর, বাইশশো বিরাশি খ্রীষ্টাব্দের সাতুই জুলাই থেকে কথা বলছি।"

হলধর বললেন, "এই অসময়ে ডাকাডাকি কিসের ?"

"ডাকাডকি। আর সাধে ? তোমাকে ভায়া এক্ষুনি একবার আসতে হচ্ছে। জরুরি কাজ, সঙ্গে তোমার সেই রুমালখানা এনো।"

হলধর জানেন, গদাধর ছেঁদো লোক নয়। কাজ আছে বলেই ডেকেছে। তাই বললেন, "পান্তাটুকু খেয়েই যাচ্ছি।"

বলে ফোন রেখে দিয়ে খেতে বসলেন। কিন্তু খেতে বসেই মনে পড়ল, কাঁচালঙ্কা নেই। কাঁচালঙ্কা ছাড়া কি পান্তা খাওয়া যায় ! কিন্তু মুশকিল হল গত একশো বছর পৃথিবীতে কাঁচালঙ্কা বা অন্য ধরনের সবজি হয়নি, হলধর তাই বরাবর তাঁর টাইম-গাড়িতে চেপে সোজা উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে গিয়ে হাজির হন এবং বেছেগুছে কাঁচালঙ্কা কিনে আনেন। চালডালও কিনে আনতে হয়। তবে এখনও তাঁর চালডালের স্টক ভালই আছে, শুধু লঙ্কা নেই, হলধর তাই বিরক্তমুখে ল্যাবরেটরির একপাশে একটা টানেলের মতো জায়গায়

ঢুকে তাঁর বিদঘুটে টাইম-গাড়িটায় চেপে বসলেন। সুইচ টিপতে গাড়িটা সময়-সমুদ্রে পিছনবাগে সাঁতার দিতে লাগল, সামনে একটা পর্দায় দ্রুত ২১৮১···২১৮০ ··২১৭৯ এবং ক্রমে ১৯৮২ ফুটে উঠতেই সুইচ টিপে গাড়ি থামিয়ে নামলেন হলধরবাবু। সামনেই পটাশপুর গাঁয়ের বাজার। আরও এক শতাব্দী পিছিয়ে যেতে পারলে সস্তায় পাওয়া যেত, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট। সেরখানেক কাঁচালঙ্কা কিনে হলধর আবার টাইম-গাড়িতে চেপে ধাঁ করে চলে এলেন ২১৮২তে। পান্তা খেয়ে ঢেঁকুর তুলে একখানা রুমাল পকেটে পুরে আবার সেই টাইম-গাড়িতে চেপে বসলেন।

২২৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না, গাড়ির দরজা খুলে নামতে দেখেন, সামনেই গদাধর দাঁড়িয়ে।

২ ৮২ খ্রীষ্টাব্দটাকে বিশেষ পছন্দ হল না হলধরের, কারণ এখানেই মাত্র একশো বছরের তফাতে তাঁর ল্যাবরেটরিটা রয়েছে, কিন্তু এখন ল্যাবরেটরির কোনো চিহ্নই নেই। একটা বিচ্ছিরি জঙ্গুলে জায়গায় তাঁর গাড়িটা থেমেছে। পারতপক্ষে নিজের শতাব্দী এবং কাছেপিঠের সময় ছাড়া তিনি ভবিষ্যৎ শতাব্দীতে পা দেন না।

একটু খেঁকিয়ে উঠে হলধর বললেন, "এর মানে কী বলো তো। আমার ল্যাবরেটরিটা কি লোপাট হয়ে গেছে নাকি ?"

গদাধর মিটিমিটি হেসে বললেন, "চটো কেন ভায়া ? অসার মাটি, তেজস্ক্রিয়তা আর আবহাওয়া দূষণের ফলে শতখানেক বছর আগেই পৃথিবীর জনবসতি লোপাট হতে শুরু করে। নিজের ল্যাবরেটরির বাইরে তো আর পা রাখো না, তাই টেরও পাও না, মানুষ সব পৃথিবী ছেড়ে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্যান্য বাসোপযোগী গ্রহে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। আছেও ভাল। এই শতাব্দীটা খুব নির্জন আর নিরিবিলি, পৃথিবীতে একটাও মানুষ নেই।"

হলধর চারদিককার বিচ্ছিরি চেহারার আগাছাগুলোর দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে বললেন, "এগুলো কি গাছ ?"

"আমি নাম দিয়েছি অ্যাটমমারি, খুব ভাল গাছ হে। পৃথিবীর সব তেজস্ক্রিয়তা শুষে নিয়েছে, আবহাওয়া পরিস্রুত করেছে, প্রায় দেড়শো বছর একটানা খরার পর আবার বৃষ্টি নামছে আজকাল এই গাছেরই গুণে, পৃথিবী আবার বাসোপযোগী হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি এই সালেই আবার মানুষকে এখানে ফিরিয়ে আনতে! সেইজন্য এখানে আজ একটা মেলা বসানো হয়েছে। বিভিন্ন শতাব্দী থেকে জ্ঞানী-গুণীরা আসবেন। নিজের নিজের কৃতিত্ব দেখাবেন। বিজ্ঞান-মেলায় তোমাকে দেখাতে হবে রুমালের খেলা।"

বেশিদূর যেতে হল না, মাইলখানেক হাঁটতেই বিশাল প্যাণ্ডেল নজরে পড়ল। বৈজ্ঞানিকরাও প্রায় সবাই হাজির। আর্কিমিডিসের পুরনো স্বভাব এখনো যায়নি, এক জায়গায় উবু হয়ে বসে মাটির ওপর কাঠি দিয়ে দাগ কেটে আঁক কষছেন। নিউটন তাঁর পোষা বেড়ালটা কোলে নিয়ে আদর করছেন একটা গাছের তলায় বসে। আইনস্টাইন একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে স্লেটে কাটাকুটি খেলছেন। সত্যেন বোস একটা বেহালার বাক্স কোলে করে বসে আইনস্টানের খেলা দেখছেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই ভাল আলাপ আছে হলধরের। টাইম-গাড়িতে পিছিয়ে গিয়ে তিনি প্রায়ই দরকারমতো এঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বেশ ভাল লোক এঁরা। দেমাক-টেমাক নেই। দেমাক সব আধুনিক এবং ভবিষ্যৎকালের বৈজ্ঞানিকদের। তাঁদের তিনি দু চোখে দেখতে পারেন না। জগদীশ বোসকেও দেখা গেল, জঙ্গল থেকে অ্যাটমমারি গাছ কয়েকটা উপড়ে নিয়ে আসছেন, মুখে হাসি। বিজ্ঞানমেলা দেখতে বিভিন্ন শতাব্দী থেকে হাজার হাজার লোক এসেছে, ভিড়ে ভিড়াক্কার, বিভিন্ন গ্রহ থেকে ক্রমাগত মহাকাশযান এসে নামছে ল্যানডিং প্যাডে, বিভিন্ন যুগ থেকে টাইম গাড়িও এসে জড়ো হয়েছে মেলায়, হলধর যখন হলঘরের মতো বিশাল মঞ্চে ঢুকলেন, তখন ২৩৮২ খ্রীষ্টাব্দের এক বৈজ্ঞানিক তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কার দেখাচ্ছেন। টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালেন তিনি, ছত্রাকটা ব্যাঙের ছাতার মতোই একটুখানি উঁচুতে উঠল মাত্র। আবিষ্কারটার

নাম বৈজ্ঞানিক দিয়েছেন বানসাই পারমাণবিক বিস্ফোরণ। মাত্র ছ' ইঞ্চি উঁচু এবং চার ইঞ্চি ব্যাসের সেই পারমাণবিক বিস্ফোরণের পকেট সংস্করণ দেখে সকলেই সবিস্ময়ে হাততালি দিল। পঞ্চবিংশ শতাব্দীর এক বৈজ্ঞানিক দেখালেন পঞ্চভূতের খেলা। ছোট্ট একটা যন্ত্রে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম মিশিয়ে চোখের পলকে একটা জ্যান্ত মানুষ তৈরি করলেন তিনি। তারপর আবার কয়েকমিনিট বাদে তাকে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিলেন।

আর্কিমিডিস আইনস্টাইনকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, "কেমন বুঝছ ?"

আইনস্টাইন মাথা চুলকে বললেন, "বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হয়েছে।"

আর্কিমিডিস ধমক দিয়ে বললেন, "ছাই হয়েছে, বিজ্ঞান আর ম্যাজিক যে এক জিনিস হয়ে গেল হে ছোকরা।"

কথাটা হলধরের কানে গিয়েছিল। ঘাবড়ে গিয়ে ঘনঘন রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন তিনি। যখন নিজের আবিষ্কার দেখানোর ডাক পড়ল তাঁর, তখন বেশ ভয় ভয় করছিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতেই তিনি মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। তারপর রুমালটা খুলে বাতাসে ভাসিয়ে দিলেন। আশ্চর্য, রুমালটা ভাসতেই লাগল। শুধু তাই নয়, হলধর সেই রুমালটার ওপর উঠে বসলেন, এবং রুমালটা তাঁকে নিয়েই শূন্যে ভাসতে ভাসতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

খুবই হাততালি পেলেন হলধর। কিন্তু সিটে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর রুমালের খেলাটাকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে আর্কিমিডিস এবং নিউটন আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। আইনস্টাইন আর সত্যেন বোস বেহালা বাজানোর উপকারিতা সম্পর্কে নিজেদের মত-বিনিময় করছেন। জগদীশ বোস গ্যালিলিওর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলছিলেন, ভাল শোনা যাচ্ছিল না। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খুব মৃদু স্বরে অটো হানকে বোঝাচ্ছিলেন যে, চা খাওয়া মোটেই ভাল নয়।

হলধর তাঁর রুমালে মুখ মুছলেন।

সামনের সিটে বসা আর্কিমিডিস হঠাৎ 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠলেন, নিউটনের বেড়ালটা পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল, হঠাৎ কামড়ে দিয়েছে, বেশ রক্ত পড়ছে গোড়ালি থেকে।

জগদীশ বোস ব্যস্তসমস্ত হয়ে হলধরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "রুমালটা দাও তো।"

"রুমাল!" বলে আর্তনাদ করে উঠলেন হলধর।

"শিগগির দাও।" বলে একরকম পকেট থেকে নিজেই তুলে নিলেন রুমালটা, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে আর্কিমিডিসের ক্ষতস্থানটা রুমাল দিয়ে সযত্নে বেঁধে দিলেন জগদীশ বসু। করুণ চোখে চেয়ে রইলেন হলধরবাবু। অ্যান্টিগ্রাভিটি সলিউশন লাগানো ছিল রুমালে। সেটা বোধহয় গেল।

জগদীশ বোস উঠে এসে হলধরের সামনে দাঁড়ালেন। কাঁধে স্নেহভরে একখানা হাত রেখে বললেন, "বাপু হে, তোমার জাদু-রুমালের খেলাটা খুব খারাপ ছিল না ঠিকই, তবু বলি আর্কিমিডিসের পায়ের ছোঁয়ায় রুমালটা ধন্য হল এতদিনে।"

হলধরবাবু বিনীতভাবে বললেন, "যে আজ্ঞে।"

জয়রামবাবু

জয়রাম বোস নস্যির ডিবেটা মঙ্গলগ্রহে ফেলে এসেছেন। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। তাড়াহুড়োয় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য যে-রকেটটা ভাড়া করেছেন, সেটা আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়া পারাপারের। সৌর-মণ্ডলের জন্য আলাদা ধীরগতির রকেট পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরার সময় এটাকেই কাছেপিঠে দেখতে পেয়ে হাতঘড়িতে লাগানো ট্রান্সরিসিভারের সংকেতে নামিয়ে এনেছিলেন। পাইলট ফাঁকতালে ছোট খেপের সওয়ারি পেয়ে কিছু বাড়তি লাভের আশায় আপত্তি করেনি বটে, তবে সে নস্যির ডিবের জন্য এখন ফিরে যেতেও নারাজ। জয়রাম কথাটা তুলতেই লোকটা বলল, "ও বাবা, আমাকে আর সাত মিনিটের মধ্যে নেবুলার ওধারে রওনা হতে হবে। আমার এ রকেট সেকেণ্ডে মাত্র দু কোটি মাইল যায়। সৌরমণ্ডল বলে আরো আস্তে চালাচ্ছি। দেরি করতে পারব না।"

জয়রাম খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই। আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়ার মাঝিরা একটু ডাঁটিয়াল হয়েই থাকে। তবে নস্যির ডিবের জন্য জয়রামের একটু উশখুশ রয়েই গেল।

জয়রামের বাড়ি একটি ভাসমান বাসগৃহ। পৃথিবীতে আর বাড়ি করার জায়গা নেই। মাটির তলাতেও আধমাইল গভীরতা পর্যন্ত গিজগিজ করছে বাড়িঘর। অবশেষে একবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধী বাড়ি তৈরি করে আকাশে ছাড়া হয়েছে। তা বলে বাড়িগুলো ভেসে বেড়ায় না, শূন্যের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একদম স্থির হয়ে থাকে। এইসব বাড়িতে বাতাস থেকে জল এবং সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থা আছে। শুধু মাঝে-মাঝে হাটবাজার করতে পৃথিবীতে নামতে হয়।

জয়রামের বাড়ির সামনে একটা খোলা মেয়ে বুঁচি এক্কাদোক্কা খেলছে। রকেটটা সেই রকের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই জয়রাম ভাড়া মিটিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন। বুঁচি 'বাবা' বলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে।

মেয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ায় জয়রাম টাল সামলাতে না পেরে পড়ো-পড়ো হয়ে পড়েই গেলেন নীচে। নীচে বলতে যদি তবে সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফুট। কিন্তু আকাশবাড়িতে যারা থাকে তাদের সকলকেই মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধী পোশাক পরতে হয়। জয়রাম তাই পড়েও পড়লেন না। শূন্যে একটু ভেসে সাঁতরে আবার বাড়ির রকে এসে উঠলেন। মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ঘরে ঢুকে মহাকাশের বিশেষ পোশাক ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে দেয়ালজোড়া টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে বললেন, আমি এখন টেলিভিশন দেখব। চ্যানেল চার, ব্যাণ্ড সাত। বলার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি-প্রতিক্রিয়ায় টেলিভিশনে ছবি ভেসে উঠল। জোর খেলা চলছে। বৈজ্ঞানিক রাখোহরির টীমের সঙ্গে যন্ত্রবিদ ফস্‌টারের টীমের ফুটবল ক্যালকুলেশন ম্যাচ। দু'দলে এগারো জন করে বাইশ জন বাঘা কমপিউটার রয়েছে। তারা বলটাকে এক বিশাল আয়তক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় চালনা করছে। রাখোহরির লেফট উইং বেঁটে কমপিউটার গদাই বলটাকে নিউট্রাল জোনে ঠেলে দিতেই ফসটারের গোল কমপিউটার ব্যারেল সেটাকে ধরে লেফট হাফ মজবুত-গড়নের গরডনের কাছে পাঠাল। রাখোহরির চকিত-চিন্তা কমপিউটার বলটাকে ধরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর কোণে নিখুঁত ঠেলে দিতেই ফসটারের পাগলা কমপিউটার মুনস্ট্রাক আর রাখোহরির ঠাণ্ডা-মাথার কমপিউটার শীতলচন্দ্রের জোর সংঘর্ষ।

জমে উঠেছিল খেলাটা। কিন্তু জয়রামের গিন্নি সৌরচুল্লিতে কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর এক বাটি সুজি করে এনে দিয়ে বললেন, "এক ছিটে আনাজপাতি নেই। বাজারে যাবে না?"

জয়রাম উঠলেন। অতিবেগুনি রশ্মি ও অন্যান্য রশ্মি দিয়ে হাতমুখ পরিষ্কার করে সুজি খেয়ে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লেন। আসল সুজি নয়, কৃত্রিম সুজি, তাই মুখটা বিস্বাদ ঠেকছিল।

গ্যারেজে ঢুকে ছোট ভারটিকাল বিমানটি বের করে নিয়ে পৃথিবীর বুকে রওনা হলেন। তাড়া নেই। আস্তে-আস্তে যাচ্ছেন। আশেপাশে আরো অনেক বাড়ি ভাসছে। দত্তগিন্নি একটা মহাজাগতিক রশ্মি আটকানোর ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে ডালের বড়ি শুকোতে দিচ্ছেন। নাক ঝাড়ল নীচে। পড়শি খলিলভাই বাজার করে ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা কাচের হেলিপ্লেনে ফিরছিল। তাকে বেতারে জয়রাম চাটুজ্যেবুড়োর বদভ্যাসের কথাটা জানিয়ে দিয়ে বললেন, "এইভাবেই একদিন দেখো আকাশবাসী আর পৃথিবীবাসীর মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠবে। এখনই সাবধান না হলে……"

নস্যির জন্য নাকটা উশখুশ করছে তখন থেকে। কিন্তু কিছু করার নেই। দুঃখিত মনে জয়রাম প্লেন নিয়ে নিউ ইয়র্কের সুপার মারকেটে নামলেন। নামে সুপার মারকেট হলেও সবজি বা আনাজ বলতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চাষের জমিতে টান পড়েছে। তাই টাটকা সবজির বদলে আজকাল সিনথেটিক খাবারেরই বেশি চলন, সবজি যাও বা কিছু পাওয়া যায়, তা আসে নীহারিকা পুঞ্জের প্রথম পর্যায়ের এক সৌরমণ্ডলের দুটি বাসযোগ্য বড় গ্রহ থেকে। কিন্তু তাতে খরচও কম পড়ে না আর পরিমাণেও তা পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ।

জয়রাম ভিড়ে থিকথিক করা বাজারে ঢুকে দেখলেন এক জায়গায় কিছু টাটকা মানকচু বিক্রি হচ্ছে। তার সামনে বিশাল লাইন। জয়রাম ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু অর্ধেক পথেই কচু ফুরিয়ে গেল। ছুটলেন অন্য জায়গায়, সেখানে কিছু তেলাকুচোর চালান এসেছে। কিন্তু তেলাকুচোও কপালে জুটল না। নস্যির জন্য নাকটা সুড়সুড় করছে কখন থেকে। মঙ্গলগ্রহে হাজার হাজার মাইল খাল খোঁড়ার কাজ তদারক করতে করতে অন্য সব কথা খেয়াল থাকে না। অথচ খাঁটি নস্যি এখানে কিনতেও পাওয়া যায় না। নীহারিকাপুঞ্জের

সবুজ গ্রহে কিছু তামাকের চাষ হয়। সেখান থেকে তাঁর বন্ধু পাণ্ডুরাম বড় একটা ডিবে এনে দিয়েছিল। দামও পড়ে যায় বিস্তর।

কাঁচা সবজি না পেয়ে জয়রাম টিনের সিল-করা প্যাকে কৃত্রিম খাবার কিনলেন। গিন্নী ভারী রেগে যাবেন। কিন্তু কী আর করা।

এমন সময় দোকলবাবুর সঙ্গে দেখা।

"কী খবর হে? বাসা কোথায় করলে?" দোকলবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে আকাশপুরীর তায়েবগঞ্জে। উত্তর রাশিয়ার ঠিক ওপরেই।"

"বাঃ, সে তো খুব ভাল জায়গা শুনেছি। এখন সেখানে জায়গার দাম কত করে বলো তো? আমার মেজো জামাই জায়গা খুঁজছে।"

"আজ্ঞে তায়েবগঞ্জে আর জায়গা নেই। পাশে নতুন একটা কলোনি হচ্ছে। নাম চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপ, সেখানে জায়গা পেয়ে যাবেন। তবে প্রতি ঘনফুট বোধ হয় এক লক্ষ ডলার করে পড়বে।"

"তা পড়ুক। জায়গা পাওয়া গেলেই হয়।" বলতে বলতে দোকলবাবু পকেট থেকে একটা রূপোর কৌটা বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে 'আঃ' বলে আরামের একটা আওয়াজ করলেন।

ডিবেটার দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে ছিলেন জয়রামবাবু। এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। নস্যি, নস্যি!

"একটু দেবেন? ঐ নস্যিটা?"

দোকলবাবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও না। আমার বড় জামাই তো সবুজ গ্রহে কাজ করে, সে আমাকে পিপে-পিপে নস্যি পাঠায়। যত খুশি নাও।" বলে দোকলবাবু উঁকি মেরে জয়রামের থলিটা দেখে বললেন, "শাকসবজি কিছু পেলে না দেখছি!"

জয়রাম পরপর দু'টিপ নস্যি টেনে আরামে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে এক গাল হাসলেন। বললেন, "নাঃ। গিন্নির কাছে আজও বকুনি খেতে হবে।"

ছাদে এসে যে যার যানবাহন খুঁজতে যাবেন, তখন দোকলবাবু বললেন, "এখনো ঢের সময় আছে। আমার বাড়ি তো কাছেই, গ্রীসে। চলো একটু বিশ্রাম করে যাবে।"

নিউ ইয়র্ক থেকে গ্রীসের দূরত্ব এয়ার কারে মাত্র আধ মিনিট। তাই জয়রামবাবু আপত্তি করলেন না। দোকলবাবু তাঁর এয়ার কারের দরজা খুলে বললেন, "উঠে পড়ো।"

পুরনো অ্যাথেন্সের বাইরে দোকলবাবুর ছোট্ট বাড়ি। তবে খুব বড়লোক ছাড়া বাড়িতে কারো বাড়তি জমি থাকে না। দোকলবাবুর আছে। কাজটা বে-আইনিও বটে। দোকলবাবু খুব লুকিয়ে পাঁচিল ঘিরে দশ হাত বাই দশ হাত একটু জমি রেখেছিলেন বাড়ির পিছনে।

জয়রামকে কফি খাইয়ে দোকলবাবু বললেন "এসো তোমাকে তাজ্জব জিনিস দেখাব একটা।" বলে প্রায় হাত ধরে টেনে পিছনের ফালি জমিটায় নিয়ে এলেন জয়রামকে।

জয়রাম থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে থ তিনি।

পৃথিবীতে অতীত কালের মানুষরা মাটিতে কেমিক্যাল সার দিয়ে-দিয়ে মাটিকে পাথরের মতো শক্ত আর জমাট করে দিয়ে গেছে। তাতে আর চাষ হয় না, সেচ চলে না, লাঙলই ঢুকতে চায় না। গাছপালা বলে কিছুই প্রায় নেই। ফালতু জমিও নেই যে গাছ লাগনো যাবে। তবে এ কী? দশ বাই দশ হাত জায়গাটায় কচি-কচি ঢেঁকিশাকের মাথা জেগে রয়েছে। কী সবুজ! কী সরস! কী অদ্ভুত।

"ঢেঁকিশাক!" জয়রাম চেঁচিয়ে উঠলেন।

দোকলবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, "উহুঁ, শব্দ কোরো না। টের পেলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে।"

জয়রাম এবার চাপা স্বরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় বলে উঠলেন, "এ যে ঢেঁকিশাক!"

"ঢেঁকিশাকই বটে। অনেক কষ্টে দশ বছরের চেষ্টায় ফলিয়েছি। নেবে ক'টা? নাও। দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি। খবর্দার, কাউকে বোলো না কিন্তু।"

“আজ্ঞে না না” বিগলিত জয়রাম বললেন।

“আর শোনো, ঐ চিউ মিং স্যাটলাইট টাউনশিপে আমার জামাইয়ের জন্য শ-পাঁচেক ঘনফুট জায়গা যোগাড় করে দিতে হবে।”

ঢেঁকিশাকের দিকে চেয়ে জয়রাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন, ‘নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।”

বারোগাছি ঢেঁকিশাক নিয়ে জয়রাম যখন বাড়িতে ফিরলেন তখনো তাঁর চোখমুখ অস্বাভাবিক, সম্মোহিত। বিড়বিড় করে কেবল বলছেন, “ঢেঁকিশাক। ঢেঁকিশাক!

বাজারদর

একশো বছর পর ঘুম ভাঙতেই রামবাবু ভারী অস্বস্তি বোধ করলেন। যে কাচের বাক্সে তিনি শুয়ে আছেন, সেটার ভিতরটা ভীষণ ঠাণ্ডা। তার ওপর চোখে তিনি সবকিছু ধোঁয়াটে দেখছেন, কান দুটো ভোঁভোঁ করছে, হাত-পা খিল-ধরা, মাথাটা খুব ফাঁকা।

কিছুক্ষণ একেবারে ভোম্বলের মতো শুয়ে রইলেন রামবাবু। তারপর আস্তে আস্তে শরীর গরম হল, কানের ভোঁভোঁ কমে গেল, হাত পায়ের খিল ছাড়ল সবকিছু মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তেই তিনি ভীষণ আঁতকে উঠে বসলেন এবং চারদিকে প্যাট-প্যাট করে তাকাতে লাগলেন। ১৯১৯ সালে তাঁকে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে একটা ঠাণ্ডা বাক্সে ভরে মাটির নীচে একটা স্টোর রুমে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল ঠিক একশো বছর পর পরবর্তী সমাজের মানুষ তাঁর ঘুম ভাঙাবে।

একশো বছর কি কেটে গেল এর মধ্যেই? চোখের দৃষ্টি কিছু স্বচ্ছ হতেই তিনি দেখলেন, কাচের বাক্সটা একটা টেবিলের ওপর রাখা, টেবিলের চারধারে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক তাঁকে গম্ভীরভাবে দেখছে।

রামবাবু প্রথমে একটা হাঁচি দিলেন, একটু কাসলেন, একটা হাই তুলে আড়মোড় ভাঙলেন। ভারী লজ্জা-লজ্জা করছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে এতদিন তাঁর বেঁচে থাকার কথা নয়। হিসেব করলে, এখন তাঁর বয়স ঠিক একশো চল্লিশ বছর। তাছাড়া এই একশো বছর পরেকার দুনিয়ায় কত কী পাল্টে গেছে। কেমন লাগবে কে জানে বাবা! তিনি প্রথমেই দেখে নিলেন মানুষগুলোর এই একশো বছরের বিবর্তনে লেজ বা শিং গজিয়েছে কি না। গজায়নি। লোকগুলো খুব লম্বা বা বেঁটে হয়ে যায়নি তো? না। লোকগুলো ভাল, না খারাপ? বোঝা

যাচ্ছে না। তবে সবচেয়ে বেশি যে-জিনিসটা তাঁর জানতে ইচ্ছে করছিল, সেটা হল বাজারদর। এখন চাল কত করে কিলো? আলু কত? মাছ কত? পালং, কপি, কড়াইশুঁটিই বা কীরকম?

রামবাবু একটু হেসে বললেন, "খুব একচোট ঘুম হল বাবা। টানা একশো বছর একেবারে।"

লোকগুলো তাঁর কথার জবাব দিল না। ভারী অভদ্র। এখনো খুব খরচোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সকলের মুখেই কাপড়ের ঢাকনা।

রামবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "হাঁ করে দেখছ কী সবাই? গত একশো বছরে আমার পেটে কিছু পড়েনি তা জানো? দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটিনি। ছুটে গিয়ে খাবার-দাবার নিয়ে এসো। আর শোনো, চায়ের নাম শুনেছ তো? চা? জানো? হ্যাঁ, এক কাপ গরম চা দাও সবার আগে।"

লোকগুলো মৃদু-মৃদু হাসছে। রামবাবু ভাবলেন, এরা বোধহয় বাংলা ভাষা বোঝে না। তার আর দোষ কী? একশো বছরে ভাষারও কত পরিবর্তন হয়ে থাকবে। এখনকার বাংলা ভাষা হয়তো চীনেভাষার মতোই দুর্বোধ্য। তাই তিনি একটু চীনে ভাষার মিশেল দিয়ে বললেন, "খাবারচুং জলদিচি লাওং। গরমং চাং দরকারং।"

বলে নিজের ওপর একটু বিরক্তই হলেন রামবাবু। চীনে ভাষা তাঁর কস্মিনকালেও জানা নেই। অজানা ভাষার ভেজাল দিতে গিয়ে বাংলাটা কেমন সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে গেল না?

লোকগুলো কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। তবে অপারেশন থিয়েটারের মতো নানারকম যন্ত্রপাতিওলা ঘরটায় তারা হরেক কলকাঠি নাড়তে লাগল। রামবাবু হাই তুলে বললেন, "আর কতক্ষণ এই প্রায় দেড়শো বছরের বুড়োটাকে তোরা দগ্ধে মারবি বাপ? খাবার না দিস একটা আয়না অন্তত দে। বুড়ো মুখটার কী ছিরি হয়েছে দেখি।"

লোকগুলো এ-কথাটা যেন কী করে বুঝতে পারল। একজন

কোত্থেকে ছোট্ট গোল হাত আয়না বের করে ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে। রামবাবু কী দৃশ্য দেখবেন সেই ভয়ে আয়নাটা মুখের সামনে ধরেও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। চোখ খুলবেন কি খুলবেন না ঠিক করতে-না-করতেই অবাধ্য চোখদুটো বে-আক্কেলের মতো খুলে গেল। কিন্তু রামবাবু খুশিই হলেন। মুখের চামড়া একটু ঝুলে গেছে ঠিকই, দাড়িও একটু হয়েছে, তবে সব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। চল্লিশ বলেই চালানো যায়।

অবশ্য এরকমই কথা ছিল। কাচের বাক্সে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তাঁকে এমনভাবেই রাখা হয়েছিল যাতে তাঁর শরীরে অতি মৃদু হৃৎস্পন্দন হয়, অতি মৃদু গতিতে রক্ত চলাচল করে, অতি মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস চলে এবং শরীরের ক্ষয়ক্ষতি নগণ্য মাত্রায় ঘটে। এই একশো বছর আসলে তিনি ছিলেন মৃত। কাজেই শরীরটার বয়স বাড়েনি।

একটা লোক তাঁর বাঁ হাতটা বাগিয়ে ধরে ইনজেকশন দিচ্ছে। তিনি তাকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন বাজারদরটা কীরকম বলতে পারো হে? আলু কত করে যাচ্ছে?

লোকটা খুব অবাক হয়ে রামবাবুর দিকে তাকাল। রামবাবু ভাবলেন, লোকটা বোধহয় বাংলা জানে না। ইংরিজিতে বললেন

"পট্যাটো?"

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, "রাইস? ডোন্‌ট ইউ রাইস?"

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু হাল ছেড়ে দেন। ইংরিজিও বিস্তর পাল্টে গেছে বোধহয়। একটা ভারী অস্বস্তি হচ্ছে মনের মধ্যে। একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক গয়েশ হালদারের সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলেন। দুশ্চিন্তা সেই বাজি নিয়ে।

একশো বছর পর তাঁর ঘুম ভাঙলে লোকেরা তাঁর ওপর বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট চালাবে, এরকম কথাই ছিল। লোকগুলো চালাচ্ছিলও তাই। ইনজেকশন দিল, রক্ত নিল, ব্লাডপ্রেশার দেখল, হাঁ করাল, শুইয়ে বসিয়ে, চিত করিয়ে, উপুড় করে, বিস্তর পরীক্ষা চালাল।

রামবাবু আপনমনে বকবক করতে লাগলেন, "চল্লিশের মতো দেখতে বলেই কি আর চল্লিশের খোকা আছি রে বাবা? বয়সটা হিসেব করে ছাখ্ না! তারপর বুঝেসুঝে খোঁচাখুঁচি করিস।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! গোমড়ামুখো লোকগুলো এক নাগাড়ে তাদের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রামবাবুর নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ পড়েনি কেন সেটাই আশ্চর্য। একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, দুটো ছেলে আর চারটে মেয়ে ছিল, মাথার ওপর বুড়ো বাপ-মা, তিন ভাই আর সাত বোনও ছিল। এই একশো বছরে তাদের কারোই আর বেঁচে থাকার কথা নয়।

ভাবতেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন রামবাবু। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। একটা লোক তাড়াতাড়ি একটা টেস্ট টিউবে সেই চোখের জল ধরে রাখল।

তবে শোকটা খুব বেশিক্ষণ রইল না রামবাবুর। আত্মীয়স্বজনরা এতকাল বেঁচে থাকলে খুনখুনে বুড়োবুড়ি হয়ে যেত সব। সেটাও ভাল দেখাত না। তিনি লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার বউ-বাচ্চারা এতকাল বেঁচে নেই জানি, কিন্তু নাতিপুতি বা তস্য পুত্রপৌত্রাদি কে আছে জানো? একটু খবর দেবে তাদের?"

একটা কিম্ভুত এক্স-রে মেশিনে তাঁকে ঝাঁঝরা করছিল লোকগুলো। পাত্তাও দিল না। তবে তারা চটপট যন্ত্রপাতি গুটোচ্ছিল। রামবাবুর মনে হল পরীক্ষা আপাতত শেষ হয়েছে। তিনি মটকা মেরে পড়ে রইলেন।

লোকগুলো কোনো সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে গেল। রামবাবু শুয়ে-শুয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। একশো বছরে বাইরের দুনিয়াটার কতটা পরিবর্তন হয়েছে, তা বুঝবার উপায় নেই এখান থেকে। এ-ঘরে নিরেট দেয়াল আর যন্ত্রপাতি। একটা পুরু দরজা আছে বটে, কিন্তু তার ওপাশে একটা করিডোর। বাইরে হয়তো এখন তুষার-যুগ চলছে, সূর্য হয়তো নিভু-নিভু হয়ে এসেছে, মানুষ

হয়তো এখন বিজ্ঞানের বলে শূন্যে হাঁটে, জিনিসপত্রের দাম হয়তো একশো গুণ করে বেড়েছে। হয়তো······।

রামবাবু শুয়ে-শুয়ে কিছুক্ষণ ঠ্যাং নাচালেন, তারপর 'দুত্তোর' বলে উঠে পড়লেন। ঘুরে ঘুরে ঘরের যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তবু এই একশো বছর পরেকার আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোর কলাকৌশল তিনি ভাল বুঝতেই পারলেন না। একটা বোতাম টিপতেই ঝড়ের মতো শোঁ শোঁ শব্দ ওঠায় তাড়াতাড়ি সরে এলেন সেখান থেকে এবং গিয়ে দরজার হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। ভাগ্য ভাল, দরজাটা হড়াক করে খুলে গেল।

কিন্তু করিডোরে পা রেখেই আঁতকে উঠলেন রামবাবু। করিডোরের মেঝেটা ঠিক নদীর ধীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। তবে চলন্ত ফুটপাথ, এসকেলেটার বা কনভেয়ার বেল্ট রামবাবুর আমলেও ছিল, তাই খুব বেশি অবাক হলেন না। মাথাটা ঘুরছিল বলে তিনি চলন্ত করিড়োরে বসে রইলেন। খানিকটা ওপরে উঠে এবং অনেকটা নীচে নেমে, খানিক ডাইনে গিয়ে এবং ফের কিছুটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে করিডোর চলতে লাগল। একটু বাদে আর একটা দরজা পেলেন। করিডোর থেকে লাফ দিয়ে নেমে দরজাটা টানলেন রামবাবু। দরজাটা খুলেও গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে রামবাবু একটা গভীর শ্বাস ছাড়লেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন তাই। না, তুষার-যুগ আসেনি বা সূর্যও নিভু-নিভু হয়নি। বরং একটার বদলে আকাশের চারধারে চারটে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা সূর্য জ্বলজ্বল করছে। আবহাওয়া খুবই মনোরম। না গরম, না ঠাণ্ডা। চারদিকে একশো দুশো তলা বাড়ি একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। আকাশেও তিনি বিস্তর বাড়িঘর ভেসে বেড়াতে দেখলেন। তারই ফাঁকে-ফাঁকে শোঁ করে নানান সাইজের রকেট উড়ে যাচ্ছে, পিরিচের মতো দেখতে কিছু জিনিসকেও উড়ে যেতে দেখলেন তিনি, আরও দেখলেন রকেট-

লাগানো চেয়ারের মতো দেখতে ছোট ছোট আকাশ-গাড়িতে মানুষ চলাফেরা করছে।

সামনের চলমান ফুটপাথে উঠে পড়লেন রামবাবু। আশেপাশে আরও সব লোকজন রয়েছে। তারা হাঁ করে দেখছে তাঁকে। দেখবেই। তাঁর পরনে সেই একশো বছর আগেকার ধুতি আর পাঞ্জাবী। এদের পরনে শুধু জাঙ্গিয়ার মতো খাটো একটু জিনিস, গা আদুড়।

রামবাবুর পাশেই একটা বুড়ো লোক। তার বয়স সত্তর বছর হবে। তা হোক, সত্তর হলেও এ লোকটা রামবাবুর চেয়ে নাহোক সত্তর বছরের ছোট। তাই আপনি বলবেন না তুমি বলবেন, তা ঠিক করতে না পেরে রামবাবু বারকয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ক'টা বাজে?"

বুড়ো লোকটা একটু অবাক হয়ে তাকাল বটে, তবে একটু খোনাস্বরে বলল, "রাত ন'টা বেজে ছত্রিশ মিনিট তেরো সেকেণ্ড।"

রামবাবু নিজে বৈজ্ঞানিক। কাজেই অবাক হলেন না। এতক্ষণে বরং বুঝলেন, আকাশে পাঁচটা সূর্য নয়, ওগুলো কোনো রকমের কৃত্রিম আলো যার ফলে চারদিকটা দিনের মতো দেখাচ্ছে। সম্ভবত ওগুলো পৃথিবীর অন্য পাশের সূর্যের আলো থেকে এপাশে আলো প্রতিফলিত করছে। এ ধরনের একটা আইডিয়া একশো বছর আগে তাঁর মাথাতেও এসেছিল। রামবাবু ফের জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তারিখটা কত বলবে বাবা?"

লোকটা অবাক চোখে ফের তাকিয়ে বলল, "জানুয়ারি, বিশ শো উনআশি।"

রামবাবু তা জানেন। তবু লোকটার সঙ্গে একটু খেজুরে আলাপ করছেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য অন্য। একশো বছর পর পৃথিবীতে কীরকম পরিবর্তন হবে না হবে, মানুষ কতটা এগোবে না-এগোবে, তা তাঁর মোটামুটি আন্দাজ ছিল। সুতরাং তিনি চারদিকের পরিবর্তন দেখে খুব অবাক হননি। কিন্তু গয়েশের সঙ্গে একটা বাজি ছিল। সেইটে বড় খোঁচাচ্ছে।

রামবাবু বললেন, "আচ্ছা সুকিয়া স্ট্রীটটা কোন্‌দিকে বলতে পারো বাবা?"

লোকটা বলে, "সুকিয়া স্ট্রীট? সুকিয়া স্ট্রীট বলে কিছু শুনিনি তো!"

"নর্থ ক্যালকাটায়।"

লোকটা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, "ক্যালকাটা? ওঃ, ক্যালকাটা নামে একটা গ্রাম আছে বটে। সে তো অনেক উত্তর দিকে!"

"এ শহরটার নাম কী বাবা?"

"এ হল গোসাবা, সুন্দরবন!"

"বটে! গোসাবা এত উন্নতি?" বলে রামবাবু চোখ কপালে তোলেন!

লোকটা হঠাৎ রামবাবুর একটা হাত খপ করে ধরে বলল, "আচ্ছা আপনি কি রামবাবু? একশো বছর আগে যাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল?"

রামবাবু খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি সে-ই। কী করে বুঝলে বাবা?"

"বুঝব না? আপনার ঘুমন্ত মুখের ছবি যে প্রায়ই টেলিভিশনে দেখানো হয়। খবরের কাগজেও বেরোয়।"

"তাই বুঝি?" বলে খুব হাসলেন রামবাবু। বললেন, "তা কলকাতার কী হল বলতে পারো বাবা?"

"সে তো আরো সত্তর-আশি বছর আগেই মশা, লোড-শেডিং আর জলের অভাবে হেজে গিয়েছিল। শহরে জঙ্গল গজিয়ে যায়। তারপর এখন অবশ্য কলকাতা আবার বর্ধিষ্ণু গ্রাম হয়ে উঠছে। ভাল চাষবাস হচ্ছে। চৌরঙ্গির আলু খুব বিখ্যাত, বাগবাজারের কুমড়ো পৃথিবীর সেরা, খিদিরপুরে মোচার সাইজের পটল জন্মায়। তাছাড়া কলকাতায় এখন 'মশা বাঁচাও' আন্দোলনের একটা হেড কোয়ার্টার হয়েছে।"

"বটে? সে আবার কী? মশা বাঁচাবে কেন বাবা?"

"মশা মেরে-মেরে মানুষ তো মশার প্রজাতিই ধ্বংস করে দিয়েছিল কিনা। যেমন একসময় আপনারা বাঘ-সিংহ মেরে মেরে সব প্রায় নিকেশ করেছিলেন। পরে আপনারা যেমন 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' করে বাঘ বাঁচাতে চেয়েছিলেন, এখন ঠিক সেইভাবেই মশা জিয়োনোর চেষ্টা চলছে।"

রামবাবু এবার আসল কথাটায় এলেন। খুব সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলবে? খুব সাবধানে বোলো। তেমন শকিং কিছু শুনলে আমার বুড়ো হার্ট থেমে যেতে পারে। এখনকার বাজারদরটা কীরকম বলতে পারো?"

"বাজারদর?" লোকটা একটু অবাক হয়, হেসেও ফেলে। বলে, "খুব চড়া।"

"খুব?" বলে রামবাবু বড় বড় চোখে তাকান। গয়েশের সঙ্গে এই নিয়েই বাজি। গয়েশ বলেছিল, একশো বছর পর বাজারদর হবে একশো গুণ, রামবাবু বলেছিলেন, কক্ষনো না। দশগুণ বড়জোর হতে পারে। রামবাবুর বুকটা তাই ঢিবঢিব করছিল। বললেন, "তবু বলো বাবা, শুনে রাখি। আচ্ছা, আগে বলো চাল কত করে।"

"চাল?" লোকটা হাসিমুখেই বলে, "চাল যাচ্ছে তিন শো টাকা।"

রামবাবু শকটা সামলাতে পারলেন না। চোখ উল্টো ফেললেন, হাত-পা কাঠ হয়ে গেল, ভির্মি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে লোকটা বলল, "কিলো নয়, কিলো নয়। কুইণ্টাল।"

রামবাবু আবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে একটা শ্বাস ছাড়লেন। আর যা হোক, বাজারদরটা ঠিক আছে।

বুদ্ধিরাম

বুদ্ধিরাম শিশিটা ঘুরিয়ে দেখছিল। লেবেলে ছাপা অক্ষর সবই খুব তেজালো। "ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ, অম্ল পিত্ত ও অজীর্ণতা রোগের নিবারণ অবশ্যম্ভাবী। অতিশয় বলকারক টনিক বিশেষ। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও অনিদ্রা রোগেরও পরম ঔষধ। বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজেরা ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।···" ছাপা অক্ষরের প্রতি বুদ্ধিরামের খুব দুর্বলতা। ছাপা অক্ষরে যা বেরোয় তার সবটাই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আদুরি অবশ্য অন্য ধাতের। বুদ্ধিরামের সঙ্গে তার মেলে না। বুদ্ধিরাম যা ভাবে, বুদ্ধিরামের যা ইচ্ছে যায় আদুরির ঠিক তার উল্টো হয়। বুদ্ধিরাম যদি নরম সরম মানুষ, তো আদুরি হল রণচণ্ডী। বুদ্ধিরাম যদি নাস্তিক, তো আদুরি হল ঘোর আস্তিক। বুদ্ধিরামকে যদি কালো বলতে হয়, তো আদুরিকে ফর্সা হতেই হবে। বিধাতা (যদি কেউ থেকে থাকে) দুজনকে এমন আলাদা মালমশলা দিয়ে গড়েছেন যে আর কহতব্য নয়।

আর সে জন্যই এ জন্মে দুজনেই আর মিল হল না। বলা ভাল, হতে হতেও হল না। এখন যদি বুদ্ধিরামের বত্রিশ তো আদুরির কোন না সাতাশ আঠাশ চলছে। দুজনের কথাবার্তা নেই, দেখাশোনাও এক রকম কালেভদ্রে, মুখোমুখি যদি বা হয় চোখাচোখি হওয়ার জো নেই। আদুরি আজকাল বুদ্ধিরামের দিকে তাকায়ও না।

কিন্তু বুদ্ধিরাম লোক ভাল। লোকে জানে, সে নিজেও জানে। বুদ্ধিরাম আগাপাশতলা নিজেকে নিরিখ করে দেখেছে। হ্যাঁ, সে লোক খারাপ নয়। মাঝে মাঝে বুদ্ধির দোষে দু-একটা উল্টোপাল্টা করে ফেললেও তাকে খারাপ লোক মোটেই বলা যাবে না।

খারাপই যদি হবে তবে সাত মাইল পথ সাইকেলে ঠেঙিয়ে চকবেড়ের হাটে কখনো আসে মন্মথ সেনশর্মার পিওর আয়ুর্বেদিক টনিক 'হারবল' কিনতে? মাত্র মাস চারেক আগে প্লুরিসিতে ভুগে উঠল বুদ্ধিরাম। এখনো শরীর তেমন জুতের নয়। কাকের মুখে কথাটা শোনা গিয়েছিল, আহ্নরির নাকি আজকাল খুব অম্বল হয়। তা এ রকম কত মেয়েরই হয়। কার তাতে মাথাব্যথা? বুদ্ধিরাম মানুষ ভাল বলেই না খোঁজখবর করতে লাগল।

তেজেনের কাছে শুনল, হারবল খেয়ে তার পিসির অম্বলের ব্যথা সেরে গেছে। কথাটা মানিক মণ্ডলের কাছেও শোনা, হ্যাঁ, হারবল জব্বর ওষুধ বটে, তিন শিশি খেতে না খেতে তার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর একদিন পরিতোষও কথায় কথায় বলেছিল, হারবল একেবারে অম্বলের যম। তবে পাওয়া শক্ত। মন্মথ কবিরাজ সেই শিবপুরের লোক, আশির ওপর বয়স। বেশী পারেও না তৈরি করতে। কয়েক বোতল করে ছাড়ে। দারুণ চাহিদা। চকবেড়ের হাটে একজন লোক নিয়ে আসে বেচতে।

খবর পেয়েই আজ মঙ্গলবারে স্কুলের শেষ ছুটো ক্লাশ অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে সাইকেল মেরে ছুটে এসেছে এত দূর। অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় আধবুড়ো খিটখিটে চেহারার একটা লোক। ময়লা চাদর পেতে কয়েকটা বিবর্ণ ধুলোটে শিশি সাজিয়ে বসেছিল। ভারী বিরস মুখ।

বুদ্ধিরাম জিজ্ঞেস করল, হারবল আছে?

লোকটা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল, আছে। সতেরো টাকা।

সতেরো টাকা শুনে বুদ্ধিরাম একটু বিচলিত হয়েছিল। দু শিশি কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কুড়িয়ে বাড়িয়েও পকেট থেকে আঠাশ টাকার বেশি বেরলো না।

আচ্ছা, দু শিশি নিলে কনসেশন হয় না?

লোকটা এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাল যেন মরা ইঁদুর দেখছে। মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, পাচ্ছেন যে সেই ঢের।

মন্মথ কবরেজের আয়ু ফুরলো বলে। তারপর হারবলও হাওয়া। মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না।

একটা শিশি কিনে বুদ্ধিরাম বলল, সামনের মঙ্গলবার আবার যদি আসি পাবো তো !

বলা যাচ্ছে না।

কথাটা যা-হোক সেটা বলার একটা রংঢং আছে তো। লোকটা এমনভাবে বলা যাচ্ছে না' বলল যা আঁতে লাগে। মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটাই যেন বাহাদুরি। বেচিস তো বাপু কবরেজি ওষুধ, তাও গাছতলায় বসে, অত দেমাক কিসের !

শিশিটা নিয়ে বুদ্ধিরাম হাটে একটু ঘুরে বেড়াল। চকবেড়ের হাট বেশ বড়। গিজগিজে ভিড়ও হয়েছে। চেনা মুখ নজরে পড়বেই। আশপাশের পাঁচ সাত গাঁয়ের লোকই তো আসে। বুদ্ধিরামের এখন চেনা কোনো লোকের সঙ্গে জুটতে ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে তার একটু একাবোকা থাকতে বড় ভাল লাগে।

জিলিপি ভাজার মিঠে মাতলা গন্ধ আসছে। ভজার দোকানের জিলিপি বিখ্যাত। শুধু জিলিপি বেচেই ভজা সাতপুকুরে ত্রিশ বিঘে ধানজমি, পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। কিনেছে তিনটে পানজাবী গাই। ডিজেল পাম্প সেট আর ট্র্যাক্টরও। ছেঁড়া গেঞ্জী আর হেঁটে ধুতি পরে এমন ভাবখানা করে থাকে যেন তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আজও ভজার সেই বেশ। নারকোলের মালার ফুটো দিয়ে পাকা হাতে খামি ফেলছে ফুটন্ত তেলে। চারটে ছোকরা রসের গামলা থেকে টাটকা জিলিপি শালপাতার ঠোঙায় বেচতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ মাছির মতো ভনভন করছে সামনে।

বুদ্ধিরাম কাণ্ডটা দেখল খানিক দাঁড়িয়ে। ডান হাতে বাঁ হাতে পয়সা আসছে জোর। ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করার সময় নেই। তার ভিতরে টাকা পয়সা এমন গিজগিজ করছে যে, চোখ কচকচ করে। টাকাপয়সার ভাবনা বুদ্ধিরাম বিশেষ ভাবে না বটে, কিন্তু একসঙ্গে অতগুলো টাকা দেখলে বুকের ভিতরটায় যেন কেমন করে।

বুদ্ধিরাম বেঞ্চে একটু জায়গা খুঁজল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি লোক। সকলেই জিলিপিতে মজে আছে। এমন খাচ্ছে যেন এই শেষ খাওয়া। ভোমা ভোমা নীল মাছি ওড়াউড়ি করছে বিস্তর। ফিতরবাগে তিনখানা বেঞ্চের একটা থেকে দুজন উঠে যেতেই বুদ্ধিরাম গিয়ে বসে পড়ল। এখনো আশ্বিনের শেষে তেমন শীতভাব নেই। দুপুরবেলাটায় গরম হয়। উনুনের তাপ আর কাঠের ধোঁয়ায় চালাঘরের ভিতরটা রীতিমতো তেতে আছে। বুদ্ধিরাম বসেই ঘামতে লাগল।

পাশের লোকটা এখনো জিলিপি পায়নি। বৃথা হাঁকডাক করছে, বলি ও ভজাদা, আধঘণ্টা হয়ে গেল হাঁ করে বসে আছি। দেবে তো!

দিচ্ছি বাপু, দিচ্ছি। দশখানা তো হাত নয়।

আর আমাদেরই বুঝি মেলা ফালতু সময় আছে হাতে?

এই চড়াটা হলেই দিচ্ছি গো।

লোকটা ফস্ করে বুদ্ধিরামের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে দেখল। তারপর মাতব্বরের মতো বলল, হারবল? মন্মথ কবরেজের ওষুধ! দুর দুর, কোনো কাজের নয়। তিন শিশি খেয়েছি।

বুদ্ধিরাম তার হাত থেকে বোতলটা ফের নিয়ে বলল, তা বেশ। কাজ হয় না তো হয় না।

লোকটা ভারী কড়া চোখে বুদ্ধিরামকে একটু চেয়ে দেখল। জিলিপি এসে পড়ায় আর কিছু বলতে পারল না। মুখ তো মাত্র একটা, এক সঙ্গে দু কাজ তো করা যায় না। তার ওপর ভজার জিলিপি মুখকে ভারী রসস্থ করে দেয়। কথা বলাই যায় না।

বুদ্ধিরামকে লোকে বলে ভাবের লোক। কথাটা মিথ্যেও নয়। বুদ্ধিরাম বড় ভাবতে ভালবাসে। ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা যে তাকে কাঁহা মুলুক নিয়ে যায়, কত আজগুবি জিনিস দেখায় তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। বুদ্ধিরাম ভজার জিলিপির দোকানে বসে বসে ভাবতে লাগল, এই যে ভজা বাঁ হাতে ডান হাতে হরির লুটের মতো পয়সা কামাচ্ছে এতে হচ্ছেটা কী?

এত জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এসব ছেড়ে একদিন

ফুটুস করে চোখ ওল্টাতে হবে। তখন ভজার ছেলেরা কেউ জিলিপির প্যাঁচ কষতে আসবে না। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি করে ভাগ ভিন্ন হবে। ভজা কি আর তা জানে না। তবু খেয়ে না খেয়ে মেলায় মেলায় রোদ জল মাথায় করে গিয়ে চালা বেঁধে কেবল জিলিপি খেলিয়ে যাচ্ছে। টাকার নেশায় পেয়েছে লোকটাকে।

বসে থাকতে থাকতে বুদ্ধিরামের পালা এসে গেল অবশেষে। ঠোঙায় আটখানা রসে মাখামাখি গরম জিলিপি। আহা, এইরকম এক ঠোঙা যদি আহুরির হাতেও গরমাগরম পৌঁছে দেওয়া যেত!

প্রথম জিলিপিটা দাঁতে কাটতে গিয়েই টপ টপ করে অসাবধানে দু ফোঁটা রস পড়ে গেল টেরিকটনের পাঞ্জাবিতে। বড় সাধের পাঞ্জাবি। ঘী রঙের, গলায় আর পুটে চিকনের কাজ করা। বুদ্ধিরাম রুমালে মুছে নিল রসটা। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। একেবারে নতুন পাঞ্জাবি। কাঁচি ধুতির ওপর এটা পরে আহুরির বাড়ির সামনে খুব কয়েকটা চক্কর দিয়েছিল। সাইকেলে। আহুরি অবশ্য বেরোয়নি। কিন্তু বুদ্ধিরামের ধারণা যে, আহুরি তাকে আড়াল থেকে ঠিকই দেখে।

জিলিপির দাম দিয়ে বুদ্ধিরাম উঠে পড়ল। সামনেই পানের দোকান। সে পান সিগারেট খায় না। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তেড়াবেঁকা আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল। না, বুদ্ধিবাম দেখতে খারাপ নয়। রংটা যা একটু ময়লা। কিন্তু মুখচোখ বেশ কাটা কাটা। নিজেকে দেখে সে একটু খুশিই হল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছে নিল।

একটা দোকানে পঞ্চাশ পয়সার কড়ারে সাইকেল জমা রেখেছিল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে উধাও মাঠ ঘাট, ধানক্ষেত। আকাশটা কী বিশাল! বাঁশবনের পেছনে সূর্য একটু ঢলে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া।

বুদ্ধিরাম ধানক্ষেতে নেমে পড়ল। চওড়া আল। খানিকদূর গিয়ে রাস্তা।

ধানক্ষেতের ভিতরে নেমে বুদ্ধিরামের মনটা আবার কেমন যেন

হয়ে গেল। আহ্লুরি কি ওষুধটা খাবে? এমনিতেই মেয়েরা ওষুধ খেতে চায় না, তার ওপর বুদ্ধিরামের পাঠানো ওষুধ। আহ্লুরি বোধহয় ছোঁবেও না। এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে। তা যাক। বুদ্ধিরামের কাজ বুদ্ধিরাম করেই যাবে।

পূজোয় একটা শাড়ি পাঠিয়েছিল বুদ্ধিরাম। বুদ্ধিরামের বোন রসকলি গিয়ে দিয়ে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে নেয়ওনি। বিরস মুখে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, কে পাঠিয়েছে রে?

রসকলি বোকা গোছের মেয়ে। ভয়ে ভয়ে শেখানো কথা বলেছিল, মা পাঠাল।

তোর মা আমাকে শাড়ি পাঠাবে কেন?

তা জানিনা। এটা পরে অষ্টমী পূজোয় অঞ্জলি দিও।

শাড়িটা ভালই। কালু তাঁতির ঘর থেকে কেনা। লাল জমির ওপর ঢাকাই বুটি।

শাড়িটার দিকে তাকায়ওনি আহ্লুরি। শুধু দয়া করে বলেছিল, ওখানে কোথাও রেখে যা।

সেই শাড়ি আজ অবধি পরেনি আহ্লুরি। নজর রেখে দেখেছে বুদ্ধিরাম। খোঁজ খবরও নিয়েছে। শাড়িটা পরেনি। তবে নিয়েছে ফিরিয়ে দেয়নি, এটাই যা লাভ হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তারপর একদিন হঠাৎই নজরে পড়ল, সেই শাড়িটা পরে রসকলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাড়িটা কোথায় পেলি?

ভয়ে ভয়ে রসকলি বলল, আহ্লুরিদিদি দিল। দিল বলেই নিলি?

তা কী করব?

বুদ্ধিরাম আর কিছু বলেনি। রাগটা গিলে ফেলেছিল। মনটা বড্ড উচাটন ছিল কয়েকদিন অপমানে।

দোষঘাট মানুষের কি হয় না?

তখন বুদ্ধিরাম তো আর এই বুদ্ধিরাম ছিল না। আজকের এক গেঁয়ো স্কুলের মাস্টার বুদ্ধিরামকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, ইস্কুলে সে ছিল ফার্স্ট বয়! পাশটাও করেছিল জব্বর, দু দুটো লেটার

নিয়ে। বিয়ের কথাটা তখনই ওঠে। বুদ্ধিরাম তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেওকেটা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

বুড়ি ঠাকুমা তখন এতটা বুড়ো হয়নি। একদিন আহুরিকে একেবারে কনে-সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলল, দেখ তো ভাই, পছন্দ হয়? হলে দেগে রাখি। পাশ টাশ করে থিতু হলে মালা-বদল করিয়ে দেবো।

আহুরি অপছন্দের মেয়ে নয়। ফর্সা তো বটেই মুখচোখ রীতিমতো ভাল।

কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে, নিত্যি দেখাশোনা হয়। যাকে বলে ঘর কা মুর্গী, তাই বুদ্ধিরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, ফুঃ, এর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

কেন রে, মেয়েটা কি খারাপ? দেখ তো কেমন মুখচোখ। কেমন ফর্সা।

সাতজন্ম বিয়ে না করে থাকলেও ও মেয়ে আমার চলবে না। যাও তো ঠাকুমা, সঙ বন্ধ করো।

একেবারে মুখের ওপর থাবড়া মারা যাকে বলে। আহুরির খুব অপমান হয়েছিল। তার তখন বছর বারো বয়স। এক ছুটে পালিয়ে গেল। আর কোনদিন এল না। খুব নাকি গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছিল মেয়েটা। দিন তিনেক ভাল করে খায় দায়নি।

বুদ্ধিরামের তখন এসব দিকে মাথা দেওয়ার সময় নেই। চৌদ্দ মাইল দূরের মহকুমা শহরে কলেজে যেতে হয়। নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন রকমের জীবন। সেখানে কে একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে ভাববার মতো মেজাজটাই তার নেই।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধিরামের সঙ্গে মেলা মেয়েও পড়ত। তাদের একজন ছিল হেনা। দেখতে শুনতে ভালতো বটেই, তার কথাবার্তা চাউনি টাউনিও ছিল ভারী ভাল। কথাবার্তা বলত টকাস টকাস।

বুদ্ধিরাম ছাত্র ভাল। সুতরাং হেনা তার দিকে একটু ঢলল।

বছর দেড়েক হেনার সঙ্গে বেশ মাখামাখি হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তবে সেটাকে ভাব ভালবাসা বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বুদ্ধিরামের আজও সংশয় আছে।

তবে হেনা আর যা-ই করুক না করুক বুদ্ধিরামের লেখাপড়ার বারোটা বাজাল। কলেজের প্রথম ধাপটা ডিঙোতেই দম বেরিয়ে গেল বুদ্ধিরামের। ডিঙোলো খোঁড়া ঘোড়ার মতো। কিন্তু হেনা দিব্যি ভাল পাশ টাশ করে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে চলে গেল।

বুদ্ধিরামের পতনের সেই শুরু। বি এস সি পাশ করল অনার্স ছাড়া। বাবা ডেকে বলল, পড়াশুনোর তো দেখছি তেমন উন্নতি হল না। তা গেঁয়ো ছেলের আর এর বেশি কীই বা হওয়ার কথা!

বুদ্ধিরাম সে-ই গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর হল না। পাশের গাঁ বিষ্টুপুরের মস্ত ইস্কুলে তখন সায়েন্সের মাস্টার খোঁজা হচ্ছে। বুদ্ধিরামকে তারা লুফে নিল।

বুদ্ধিরামের মনের অবস্থা তখন সাঙ্ঘাতিক। রাগে দুঃখে দিনরাত সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে আর পোড়ে। লেখাপড়ায় একটা মারকাটারি কিছু করে বিজয়গর্বে গাঁয়ে ফিরে আসবে, এই না সে জানত। আর সে জায়গায় টিকিয়ে টিকিয়ে মোটে বি এস সি! বুদ্ধিরাম কিছুদিন আপনমনে বিড় বিড় করে ঘুরে বেড়াত পাগলের মতো, দাড়ি রাখত, পোশাক আশাকের ঠিক ছিল না। আত্মহত্যা করতে রেল রাস্তায় গিয়েছিল তিনবার। ঠিক শেষ সময়টায় কেমন যেন সাহসে কুলোয়নি।

তারপরই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। এমনি দেখতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু তার মধ্যেই বুদ্ধিরামের জীবনটা একটা মোড় ঘুরল। আম বাগানের ভিতর দিয়ে বিশু আর বুদ্ধি জিতেন পাড়ুইয়ের বাড়ি যাচ্ছিল মিটিং করতে। জিতেন সেবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে নেমেছে। জিতেনকে জেতানোর খুব তোড়জোর চলছে। বুদ্ধিরাম তখন যা হোক একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকার জন্য ব্যস্ত। জীবনের হাহাকার আর ব্যর্থতা ভুলতে মাথাটাকে কোনো একটা

ভূতের জিম্মায় না দিলেই নয়। নইলে জিতেনের ইলেকশন নিয়ে কেনই বা বুদ্ধিরামের মাথাব্যথা হবে!

আমবাগানে শরৎকালের একটা সোনালী রূপালী রোদের চিকরিকাটা আলো-ছায়া। সকালবেলাটায় ভারী পরিষ্কার বাতাস ছিল সেদিন। ঘাসের শিশির সবটা তখনো শুকোয়নি।

উল্টো দিক থেকে একটা ছিপছিপে মেয়ে হেঁটে আসছিল। একা, নতমুখী। তার চুল কিছু অগোছালো এলো খোপায় বাঁধা। আঁচলটা ঘুরিয়ে শরীর ঢেকেছে। দেখে কেমন যেন মনটা ভিজে গেল বুদ্ধিরামের।

কে রে মেয়েটা?

দুর শালা! চিনিস না? ও তো আহ্লাদি।

আহ্লাদি! বুদ্ধিরাম এত অবাক হল যে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল হাঁ হয়ে। এক গাঁয়ে বাস হলেও আহ্লাদির সঙ্গে তার দীর্ঘকাল দেখা হয়নি। কারো দিকে তাকায়ও না বুদ্ধিরাম। সেই আহ্লাদি কি এই আহ্লাদি?

আহ্লাদি মাথা নিচু করে রেখেই তাদের পেরিয়ে চলে গেল। ভ্রূক্ষেপও করল না।

আর সেই ঘটনাটা সারাদিন বুদ্ধিরামের মগজে নতুন একটা ভূত ঢুকে গেল।

বাড়ি ফিরেই সে ঠাকুমাকে ধরল, শোনো ঠাকুমা, একটা কথা আছে।

কী কথা!

সে-ই যে আহ্লাদি মনে আছে?

আহ্লাদিকে মনে থাকবে না কেন?

ওকেই বিয়ে করব। বলে দাও।

ঠাকুমা তার পিঠে হাত টাত বুলিয়ে বলল, বড্ড দেরী করে ফেললি ভাই, আহ্লাদির তো শুনছি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। হরিপুরের চন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে পরেশের সঙ্গে।

বুদ্ধিরাম এমন তাজ্জব কথা যেন জীবনে শোনেনি। আহ্লাদির

বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাহলে তো খুব মুশকিল হবে বুদ্ধিরামের।

সেই দিনই সে গোপনে তার দু-একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শে বসে গেল।

কেষ্ট বলল, বিয়েটা না ভাঙতে পারলে তোর আশা নেই। ভাঙতে হলে সবচেয়ে ভাল উপায় হল চন্দ্রনাথ মল্লিককে একখানা বেনামা চিঠি লেখা।

তো তাই হল। কেষ্ট নানা ছাঁদে লিখতে পারে। তার সাইন বোর্ডের দোকান আছে। চিঠিটা সে লিখে দিল।

দিন সাতেক বাদে শোনা গেল, বিয়ে ভেঙে গেছে।

বুদ্ধিরাম ভেবেছিল, এবার জলের মতো কাজটা হয়ে যাবে। সে গিয়ে ফের ঠাকুমাকে ধরল, শুনছি আহ্লাদির বিয়েটা ভেঙে গেছে। তা আমি রাজি আছি বিয়ে করতে।

ঠাকুমা গেল প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিরাম নিশ্চিন্তে ছিল। এরকম প্রস্তাব তো মেয়ের বাড়ির পক্ষে স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু সন্ধেবেলা ফিরে এসে ঠাকুমা বিরস মুখে বলল, মেয়েটার মাথায় ভূত আছে।

কেন গো ঠাকুমা?

মুখের ওপর বলল, ও ছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

বুদ্ধিরাম একথায় এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে বলার নয়। বলল? এত বুকের পাটা? সেই রাতে বুদ্ধিরাম ঘুমোতে পারল না। কেবল ঘরবার করল, দশবার জল খেল, ঘন ঘন পেচ্ছাব করল। মাথার চুল মুঠো করে ধরে বসে রইল। রাগে ক্ষোভে অপমানে তার মাথাটাই গেল ঘুলিয়ে।

ভোরের দিকে সে একটু ঝিমোলো। ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবল, বহোৎ আচ্ছা! এইরকম তেজী মেয়েই তো চাই। গেঁয়ো মেয়েগুলো যেন ভেজানো ন্যাতা। কারো ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। আহ্লাদির আছে, এটা তো খুব ভাল খবর।

সকালবেলায় সে একখানা পেল্লায় সাত পৃষ্ঠার চিঠি লিখে ফেলল আহুরিকে। মেলা ভাল ভাল শব্দ লিখল তার মধ্যে। অন্তত গোটা পাঁচেক কোটেশন ছিল। সবশেষে লিখল…"তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।"

রসকলির হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে সে ঘরে পায়চারী করতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। আজ অবধি সে কোনো মেয়েকে প্রেমপত্র লেখেনি। এই প্রথম।

রসকলি ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে বলল, ও দাদা, চিঠিটা যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলল গো।

চুপ। চেঁচাস না। কিছু বলল না?

কি বলবে? শুধু জিজ্ঞেস করল চিঠিটা কে দিয়েছে। তোমার কথা বলতেই খামসুদ্ধ চিঠিটা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বোনের কাছে ভারী অপদস্থ হয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। তবে রসকলি হাবাগোবা বলে রক্ষে।

বুদ্ধিরাম বলল, কাউকে কিছু বলিস না। ভাল একটা জামা কিনে দেবোখন।

তখন অপমানে লাঞ্ছনায় বুদ্ধিরামের পায়ের তলায় মাটি নেই। সারা দিনটা তার কাটল এক ঘোরের মধ্যে। কিন্তু দুদিন বাদে সে বুঝতে পারল, আহুরি যত কঠিনই হোক তাকে জয় করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তবে বুদ্ধিরাম আর বোকার মতো চিঠি চাপাটি চালাচালিতে গেল না। আহুরির ধাতটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

গাঁয়ের মেয়ে। সুতরাং তাদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই আজন্ম চেনাজানা বুদ্ধিরামের। তবে সে দেমাকবশে কারো বাড়িতেই তেমন যেতটেত না। ঘটনার পর দিন কয়েক আহুরিদের বাড়িতে হানা দিতে লাগল সে। আহুরির কাকা জ্যাঠা মিলে মস্ত সংসার। বড় গেরস্ত তারা। তিন চারখানা উঠোন, বিশ পঁচিশটা ঘর। সারা দিন ক্যাচ ম্যাচ লেগেই আছে। বুদ্ধিরাম গিয়ে যে খুব সুবিধে করতে

পারল তা নয়। বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে হয়তো কখনো আহ্লরির কেশো দাদুর সঙ্গে খানিক কথা কয়ে এল। না হয়তো কোনোদিন আহ্লরির জ্যাঠা হারুবাবুর কিছু উপদেশ শুনে আসতে হল।

চা-বিস্কুটও যে জোটেনি তা নয়। সে গাঁয়ের ভাল ছেলে। খাতির একটু লোকে করেই। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে যাওয়া সেদিকে কিছুই এগোলো না।

কিছুদিন পর সে বুঝল, এভাবে আহ্লরির কাছে এগোনো যাবে না। মহিলা মহলে ঢুকতে হবে। তা তাতেও বাধা ছিল না। আহ্লরিদের অন্দরমহলেও ঢুকতে সে পারে। আহ্লরির এক বউদি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, হ্যাঁ গো বুদ্ধি ঠাকুরপো, কোনোকালে তো তোমাকে এ বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখিনি। তোমার মতলবখানা কী খুলে বলো তো! আমার তো বাপু, তোমার মুখচোখ ভাল ঠেকছে না।

এ কথায় আর এক দফা অপমান বোধ করল বুদ্ধিরাম। সে পুরুষ মানুষ, কোন লজ্জায় মা মাসী বউদি শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করে?

সুতরাং বুদ্ধিরামকে জাল গোটাতে হল।

তারপরই আবার বিপদ। আহ্লরির ফের সম্বন্ধ এল। চেহারাখানা ভাল, কিছু লেখাপড়াও জানে, সুতরাং আহ্লরিকে যে দেখে সে-ই পছন্দ করে যায়।

দ্বিতীয় পাত্রপক্ষকেও বেনামা চিঠি দিতে হল। ভেঙেও গেল বিয়ে। কিন্তু তাতে বুদ্ধিরামের যে কাজ খুব এগোল তাও নয়। বরং উল্টে একটা বিপদ দেখা দিল। কেউ যে বেনামা চিঠি দিয়ে আহ্লরির বিয়ে ভাঙছে এটা বেশ ঠাউর হয়ে গেল। লোকটা কে তার খোঁজাখুঁজিও শুরু হল। তৃতীয়বার যখন আহ্লরিকে পছন্দ করে গেল আর এক পাত্রপক্ষ তখন আহ্লরির বাপ জ্যাঠা পাত্রপক্ষকে বলেই দিল, বেনামা চিঠি যেতে পারে, আমল দেবেন না। কোনো বদমাশ লোক করছে এই কাজ।

খুবই ভয়ে ভয়ে রইল বুদ্ধিরাম। কেষ্ট ভরসা দিয়ে বলল, আরে

ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? এমন কলঙ্কের কথা দেবো যে, পাত্রপক্ষ আঁতকে উঠবে।

কিন্তু এই তৃতীয়বার বুদ্ধিরাম ধরা পড়ে গেল। আহ্লরির সাত সাতটা গুণ্ডা ভাই একদিন বাদামতলায় চড়াও হল তার ওপর। সতীশটা মহা ষণ্ডা। সে-ই সাইকেল থেকে টেনে নামাল বুদ্ধিরামকে।

বলি, তোর ব্যাপারটা কী ?

কিসের ব্যাপার ?

ন্যাকা ! আহ্লরির বিয়ে ভাঙতে চিঠি দেয় কে ?

আমি না।

তুই ছাড়া আর কে দেবে !

আমার কী স্বার্থ ?

মেজো বউদি বলছিল তুই নাকি আমাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করতিস!

বুদ্ধিরাম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিল। সত্য গোপন করার অভ্যাস তার নেই। গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলা তার আসেও না। সে আমতা আমতা করতে লাগল।

সতীশ অবশ্য মারধর করল না। বলল, যদি আহ্লরিকে বিয়ে করতে চাস তো সে কথা বললেই হয়। গাঁয়ে তোর মতো ছেলে ক'টা ? আর যদি নিতান্তই বদমাইশির জন্য করে থাকিস তাহলে···

বুদ্ধিরাম কেঁদে ফেলেছিল। একটু সামলে নিয়ে বলল, বিয়ে করতে চাই।

সাবাশ। বলে খুব পিঠ চাপড়ে দিল সতীশ। বলল, একথাটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো হল। আগে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যবস্থা হল না। পরদিনই সতীশ এসে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মুশকিল কি হয়েছে জানিস ? তোর ওপর আহ্লরি মহা খাপ্পা। কী করেছিলি বল তো।

সব শুনেটুনে সতীশ বলল, আচ্ছা, চুপচাপ থাক। দেখি কী করা যায় !

বলা পর্যন্তই। সতীশ কিছু করতে পারেনি। চিড়ে ভেজেনি।

কিন্তু এরপর থেকে আহুরির আর সম্বন্ধ আসত না। এলেও আহুরি বেঁকে বসত।

এ সবই সাত আট বছর আগেকার কথা। এই সাত আট বছর ধরে বুদ্ধিরাম আড়াল থেকে আহুরির উদ্দেশ্যে তার সব অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। প্রতিবার পুজোয় শাড়ি পাঠায়, টুকটাক উপহার পাঠায়, কোনোটাই আহুরি নেয় না। নিলেও ফেলে টেলে দেয় বা অন্য কাউকে দান করে।

কিন্তু বয়স তো বসে নেই। আহুরির বিয়ের বয়স পার হতে চলল। বুদ্ধিরামও ত্রিশ পেরিয়েছে কোনো দিকেই কিছু এগোলো না। আহুরির কপাট বজ্র আঁটুনিতে বন্ধই রইল।

ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে এসব কথাই ভাবছিল বুদ্ধিরাম।

বড় রাস্তায় উঠে সে সাইকেলে চাপল। পাঞ্জাবির পকেটে ভারী শিশিটা ঝুল খাচ্ছে। কষ্ট করাই সার হল। কোনো মানে হয়না এর।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখে বাস রাস্তায় কয়েকটি দোকান। আঁধার হয়ে এসেছে। টেমি জ্বলছে দোকানে দোকানে। মহীনের চায়ের দোকানে দু-চারজন বসে আছে। ষষ্ঠী হাঁক মারল, কে রে! বুদ্ধি নাকি?

বুদ্ধি নেমে পড়ল। সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে বসে গেল। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। এক ভাঁড় চা হলে হয়।

ষষ্ঠী একটু বেশি কথা কয়। নানা কথা বকবক করে যাচ্ছিল। সে একটু তেলানো মানুষ। যাকে দেখে তাকেই একটু একটু তেল দেওয়া তার স্বভাব। পুরনো কথার সূত্র ধরে বলল, তোর কত বড় হওয়ার কথা ছিল বল তো! গাঁয়ে আজ অবধি তোর মতো বেশি নম্বর পেয়ে কেউ পাশ করেছে? বসন্ত স্যার তো বলতই, বুদ্ধিরামের মতো ছেলে হয় না। যদি লেগে থাকে তো জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু একটা হয়ে ছাড়বে।

এইসব পুরোনো ব্যর্থতার কথা। বুদ্ধিরাম যা খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। ধীরে ধীরে তার আঁচ নিবে গেছে। সে গাঁয়ের মাস্টার

হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মাপে ছোটো করে ফেলেছে। সয়েও গেছে সব। কিন্তু কেউ খুঁচিয়ে তুললে আজও বুকটা বড় উথাল-পাথাল করে।

ষষ্ঠী, চুপ কর। ওসব কথা বলে আর কী হবে!

আমরা যে তোর কথা সব সময়েই বলাবলি করি। চোখের সামনে দেখেছি কিনা। কী জিনিস ছিল তোর ভিতরে।

বুদ্ধিরাম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে উঠল। বলল, যাই। ছাত্ররা সব এসে বসে থাকবে।

যা।

বুদ্ধিরাম সাইকেলে চেপে বড় রাস্তা থেকে গাঁয়ের পথে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাস্তায় হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। তাদের মিটমিটে আলোয় কিছুই প্রতিভাত হয়না। অথচ জ্বলে। লাখো লাখো জ্বলে। তাহলে কী লাভ জ্বলে?

মোট দশ জন ছাত্র তার বাড়িতে এসে পড়ে। মাথা পিছু কুড়ি টাকা করে মাস গেলে দুশো টাকা তার আসার কথা। কিন্তু নগদ টাকা বের করতে গাঁয়ের লোকের গায়ে জ্বর আসে। বাকি বকেয়া পড়ে যায় অনেক। তবু বুদ্ধিরাম সবাইকেই পড়ায়। বেশির ভাগই গবেট। দু একজন একটু আধটু বোঝে সোঝে।

পড়াতে বসবার আগে পাতুকে ডেকে শিশিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ও বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়। তার হাতে দিস।

রসকলির বিয়ে হয়ে গেছে। একটু বয়সকালেই হল। এখন রসকলির জায়গা নিয়েছে বুদ্ধিরামের ভাইঝি পাতু। আহুরি আর বুদ্ধিরামের ব্যাপারটা দুবাড়ির কারো আর অজানা নেই। সুতরাং নাহক লজ্জা পাওয়ারও কোনো মানে হয় না।

হাতমুখ ধুয়ে পড়াতে বসে গেল বুদ্ধিরাম। কিছুক্ষণ আর অন্যদিকে মনটা ছোটাছুটি করলনা। ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

এই ভুলে থাকাটাই এখন বুদ্ধিরামের কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

যত ভুলে থাকা যায় ততই ভাল। জীবনটা আর কতই বা লম্বা! একদিন আয়ু ফুরোবেই। তখন শান্তি। তখন ভারী শান্তি।

পড়িয়ে যখন উঠল বুদ্ধিরাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ছাত্ররা যে যার লণ্ঠন হাতে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুদ্ধিরাম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখল। এরপর তার একা লাগবে। খুব একা।

পাতু ফিরে এসেছে। বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কোলের ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

হাতে দিয়েছিস তো!

হ্যাঁ গো।

কিছু বলল?

না। শিশিটার গায়ে কী লেখা আছে পড়ল। তারপর তাকে রেখে দিল।

ভাতের গন্ধ আসছে। জ্যাঠামশাইয়ের কাশির শব্দ। কে যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে ছপাৎ ছপাৎ করে। দুটো কুকুরে ঝগড়া লেগেছে খুব। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধিরাম বাইরের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নার দিকে আনমনে চেয়ে রইল।

না. বেঁচে থাকাটার কোনো মানেই খুঁজে পায় না সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘরখানা তার। ঘরে একখানা চৌকি, একটা টেবিল আর চেয়ার আর একখানা বইয়ের আলমারি।

বুদ্ধিরাম চেয়ারে বসে লণ্ঠনের আলোয় একখানা বইয়েব পাতা খানিকক্ষণ ওল্টাল। বইটা কী, কোন বিষয়ের তাও যেন বুঝতে পারছিল না। বইটা রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নারও কোনো অর্থ হয় না। ঝড় বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। অথচ বেঁচে থাকতে হবে। এ কী জ্বালা রে বাপ?

বউদি এসে খেতে ডাকল বলে বেঁচে গেল বুদ্ধিরাম। খাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। তবু সেটা একটা কাজ। কিছুক্ষণ সময় কাটে

কথাবার্তা হয়, হাসিঠাট্টা হয়। সময়টা কেটে যায়। বুদ্ধিরাম গিয়ে সাগ্রহে খেতে বসল।

খেয়ে এসে বুদ্ধিরাম ফের কিছুক্ষণ বসে রইল চেয়ারে। চেয়ারে বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়ল, কে জানে।

পাতু এসে জাগাল, ওঠো সেজকা, বিছানা করে মশারি ফেলে গুঁজে দিয়েছি। শোওগে।

হাই তুলে উঠতে যাচ্ছিল বুদ্ধিরাম, পাতু ফের বলল, আজ ও বাড়ির সকলের মন খারাপ। নিবারণদাদুর অবস্থা ভাল নয়। আহুরি পিসির চোখ লাল। খুব কাঁদছিল।

নিবারণ মানে হল আহুরির বাবা। বুদ্ধিরাম খবরটা শুনল মাত্র। মনে আর কোনো বুজকুরি কাটল না। কলঘর ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। বাপ যদি মরে তো আহুরির মাথা থেকে ছাদ উড়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমলো বুদ্ধিরাম। আজকাল নির্বোধের মতোই সে ঘুমোতে পারে। মাথাটা আস্তে আস্তে বোকা হয়ে যাচ্ছে তো। বোধবুদ্ধি কমে যাচ্ছে। আজকাল তাই গাঢ় ঘুম হয়।

মাঝরাতে আচমকা চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাঙল। ভাঙতেই সোজা হয়ে বসল বুদ্ধিরাম। চেঁচামেচিটা অনেক দূর থেকে আসছে। আহুরির বাপের কি তবে হয়ে গেল?

উঠবে কি উঠবে না তা ভাবছিল বুদ্ধিরাম। ও বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীই বা আর? না গেলেও হয়। রাতে একটু শীত পড়েছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা কাঁথা। সেটা গায়ে টেনে নিতেই ভারী একটা ওম আর আরাম হল। বুদ্ধিরাম চোখ বুজল।

ঘুমিয়েই পড়ছিল প্রায় এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেজদা বলল, বুদ্ধি, ওঠ। নিবারণ জ্যাঠার হয়ে গেল। একবার যেতে হয়। ও বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।

বুদ্ধিরাম উঠল। যারা বেশিরাতে মরে তাদের আক্কেল বিবেচনার বড় অভাব। বলল, যাচ্ছি।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। গাঁসুদ্ধু জেগে গেছে। আজকাল গাঁয়ে লোকও বেড়েছে খুব। রাস্তায় নামলেই বেশ লোকজন দেখা যায়। এই মাঝরাতেও ঘুম ভেঙে অন্তত জন ত্রিশ চল্লিশ লোক নেমে পড়েছে রাস্তায়, আহুরিদের বাড়ি যাবে বলে।

একটা হাই তুলল বুদ্ধিরাম। শরীরটা এখনো ঘুমজলে অর্ধেক ডুবে আছে। শরীরের যেটুকু জেগে আছে সেটাকেও চালানো যাচ্ছে না।

বাইরের উঠোনেই নিবারণ জ্যাঠাকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়েছে। চেঁচিয়ে এ ওর গলাকে ছাপিয়ে কান্নার কম্পিটিশন চলেছে। কোনো মানে হয় না। জন্মালেই তো মানুষের মধ্যে মৃত্যুর বীজ পোঁতা হয়ে গেল। এভাবেই যেতে হবে। সবাই যায়।

গোটা দশেক লণ্ঠন আর দুটো হ্যাজাক বাতির আলোতেও এই ভীড়ের মধ্যে আহুরিকে দেখতে পেল না বুদ্ধি। আহুরি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। চেঁচিয়ে কাঁদবে না, জানে বুদ্ধিরাম। আর সে আসায় হয়তো ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। মুখ দেখতেও বুঝি ঘেন্না হয় আজকাল।

মাস চারেক আগে প্লুরিসি থেকে উঠেছে বুদ্ধিরাম। বুক থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে জল টেনে বের করতে হয়েছিল গামলা গামলা। তার ঠাণ্ডা লাগানো বারণ। কিন্তু সে বুদ্ধিরাম ছাড়া আর কে-ই বা মনে রেখেছে।

শ্মশানে গেলে স্নান করে আসতে হবে। শেষ রাতের শীতে হিম বাতাস লাগবে শরীরে। ডাক্তার ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছিল।

বুদ্ধিরাম একটু হাসল। সে রেলরাস্তায় গলা দিতে গিয়েছিল। মরণকে তার ভয়টয় নেই। একভাবে না একভাবে তো যেতেই হবে।

কান্নাকাটির মধ্যেই কিছু লোক বাঁশ টাশ কাটতে লেগেছে। দড়িদড়া এসে গেছে। বুদ্ধিরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য।

মোড়লদের মধ্যে শলা-পরামর্শ হচ্ছে। সেই দলে বুদ্ধির বাপ জ্যাঠাও আছে। অন্য ধারে গাঁয়ের অল্পবয়সী ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি।

আচমকাই—একেবারে অপ্রত্যাশিত, আহুরিকে দেখতে পেল বুদ্ধিরাম। উত্তরের ঘরের দাওয়ায় তিন চারজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দলে বুদ্ধির জ্যাঠাইমাও। আহুরি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা বুদ্ধির দিকে তাকাল। গত দশ দছরে বোধহয় প্রথম।

বুদ্ধি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। না, ভুল দেখছে না। হ্যাজাকের আলোয় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বাপের মড়া উঠানে শোওয়ানো। তবু আহুরি সোজা তার দিকেই চেয়ে আছে। একেবারে নিষ্পলক।

আজ বুদ্ধিরামই চোখ সরিয়ে নিল। তারপর আড়ে আড়ে চাইতে লাগল। মেয়েটার হল কী?

আহুরি তার জ্যাঠাইমার কানে কী যেন বলল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে নরম ভঙ্গিতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তাতে যেন ভারী ফুটে উঠল আহুরি। কী যে দেখাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল।

বুদ্ধিরাম অগত্যা এগিয়ে গিয়ে বলল, কী গো জ্যাঠাইমা?

মড়া ছুঁয়েছিস নাকি?

না। তবে এবার তো ছুঁতে হবেই।

কাজ নেই বাবা। বাড়ি যা। গায়ে গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা ছিটিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। তোকে শ্মশানে যেতে হবে না।

কেন?

কেন আবার। ক'দিন আগে কী অসুখটা থেকেই না উঠলি। ঠাণ্ডা লাগলে আর বাঁচবি নাকি?

আমার কিছু হবে না জ্যাঠাইমা, ভেবো না।

কেন, তোরই বা যেতে হবে কেন? শ্মশানে যাওয়ার কি লোকের অভাব? কত লোক জুটে গেছে! আহুরি মনে করিয়ে দিল, তাই। যা বাবা, ঘরে যা।

আর একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বলল, কে মনে করিয়ে দিল বললে?

আহুরি অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পাচ্ছে। নড়ল না।

জ্যাঠাইমাও আর তাকে আমল না দিয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

বুদ্ধিরাম ধীর পায়ে ছেলে ছোকরাদের দঙ্গলটার কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধিদা, যাবে তো!

যাবো না মানে ?

তা গেল বুদ্ধিরাম। মড়া কাঁধে নেচে নেচে গেল। বহুকাল পরে তার এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল আজ। না, প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ নয়। প্রতিশোধের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। আজ তার আনন্দ হচ্ছিল একটা অন্য কারণে। ঠিক কেন তা সে বলতে পারবে না।

মড়া পুড়ল। বুদ্ধিরাম কষে স্নান করল নদীর পাথুরে ঠাণ্ডা জলে। দুনিয়ার একজনও অন্তত তার অসুখটার কথা মনে রেখেছে, এখন আর মরতে বাধা কী!

ভেজা গায়ে যখন উঠে এল বুদ্ধিরাম তখন শেষ রাতের হিম বাতাসে সে থরথর করে কাঁপছিল। সবাই কাঁপছে। কিন্তু তার কাঁপুনিটা আলাদা। লোকে বুঝতে পারল না। শুধু বুদ্ধিরামের নিজের ভিতরে যে নানা ভাঙচুর হচ্ছিল তা নিজেই টের পেল সে।

হোঁৎকা সতীশ কাছেই দাঁড়িয়ে গামছা নিংড়োচ্ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে বুদ্ধিরামের দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁরে বুদ্ধি, তুই যে বড় স্নান করলি ?

করব না তো কী ?

সতীশ মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বলল, তোর না কী একটা অসুখ হয়েছিল ক'দিন আগে!

কে বলল তোকে ?

সতীশ গামছাটা ফটাস ফটাট করে ঝেড়ে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, বেরোবার মুখে আহুরি এসে ধরেছিল আমায়। বলল, বটে,

রাঙাদা, বুদ্ধিরামের কিন্তু শরীর ভাল নয়। হিমজলে স্নান করলে মরবে। ওকে দেখো।

বুদ্ধিরাম কোন কথা বলল না। গলার কাছে একটা দলা আটকে আছে। চোখে জল আসছিল।

সতীশ গা মুছতে মুছতে বলল, তোর আক্কেল নেই? কোন বুদ্ধিতে এই সকালে স্নান করলি?

ভুর শালা! আজই তো স্নানের দিন। আজ স্নান করব না তো কবে করব?

কে হে বট বাঁশের দোলাতে চেপে যাচ্ছো চলে শ্মশানঘাটে ? কে হে বট ? তোমার ঘটিবাটি রইল পড়ে জুড়িগাড়ি কে হাঁকাবে ? কে হে বট ? যাচ্ছো চলে···

এই সময়টায় কাশি এসে পড়ে। গলায় কে বিচুটি ঘষে দিয়েছে বটে। কাশিটার কোনও বাপ-মা নেই। সেই কবে থেকে সেঁদিয়ে আছে। কাশির তাড়সে রতামাক গেছে, তেঁতুল গেছে, পাকা কলার ছায়াটি মাড়ানো পাপ। বটেশ্বরকে বাঁচতে হচ্ছে এসব ছাড়াই। গান-বাজনা যাই-যাই করেও একটু ছিল। এখন তাও যায় বুঝি।

কাশিটা কিছুক্ষণ নাগাড়ে হয়ে যেতে লাগল। কোন বেটাচ্ছেলে শিরীষ কাগজ সঁাদ করিয়েছে, গলার মধ্যে। তারপর ঘষটাচ্ছে আর ঘষটাচ্ছে। শব্দ সাত পাড়া ধরে শোনা যাচ্ছে। শুধু নিতাইয়ের মায়ের কানেই বোধ হয় যাচ্ছে না। পুরানো তেঁতুল আর এখোগুড় জলে গুলে খেলে কাশি ফর্সা। তা এ বাড়িতে দুটোর কোনওটারই জোগাড় নেই। জোগাড় অনেক কিছুরই নেই। এ বেলা হাঁড়ি চড়ে তো ওবেলা চড়ে না। বটেশ্বরের তিন ছেলে তিন রকমের কুষ্মাণ্ড, বড়টা ছিচকে চোর, এখন হাজতে আছে। মেজোটা হাবাগোবা, ছোটটা বাউণ্ডুলে, যাত্রা দলের নটবর। ঘাড়ে এখনও একটা সোমত্থ মেয়ে। সংসারের হাল দেখে বটেশ্বর এখন ফাঁক বুঝে টুক করে মরে যাওয়ার তালে আছে। চোখটি বুজে ফেললে আর কার বোঝা কে বয় ? যতক্ষণ শ্বাস চলছে ততক্ষণই এই কাশির কষ্ট, ভাতের কষ্ট, ছেলের কষ্ট, মেয়ের কষ্ট। কত মাপের কত দুঃখ আর কষ্ট জুড়ে জুড়ে সেলাই করে তবে বটেশ্বরের জীবনের কাঁথাখানা ভগবান বানিয়েছেন। অনেক হয়েছে, এখন বটেশ্বর কাঁথাখানা খুলে ফেলে দিয়ে একখানা ভোঁ-দৌড় মারতে চায়।

কাশিটার পর শরীর একটু হ্যাদানো লাগে। বটেশ্বর রোদে পা ছড়িয়ে মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ বটেশ্বর যতদূর পারে নিজেকে উল্টেপাল্টে রোদে বেগুনপোড়া করে রাখে। শীতটা ঘনিয়ে উঠছে খুব। সামনে বাঘা মাঘ। এমন কাঁপন দেবে এবার 'বাপ' ডাকিয়ে ছাড়বে। কিন্তু এই সারাদিন রোদে ভাজা-ভাজা হয়েও লাভ নেই। যে-ই সন্ধেটি নামল অমনি একেবারে আঁত-অবধি অবশ করে দিয়ে ভেজা কাঁথার মতো শীতও এসে সাপটে ধরল।

বটেশ্বর খানিক জিরিয়ে উঠল। যতই ভাঙা কুলোর মতো ফেলে রাখা হোক তাকে, সে যতদিন না নির্বংস মরছে ততদিন বাড়ির কর্তা। এই যে তিনখানা টিনের চালের ঘর, দরমার বেড়া, ইঁটের গাঁথনির ওপর, মাটির পলেস্তারা দেওয়া ভিত এ বলতে গেলে তার নিজের হাতেই গেঁথে তোলা। এক সঙ্গে নয়, তিনখানা ঘর তুলতে বছর পাঁচেক লেগেছিল। প্রথমটায় নতুন টিন রোদে এমন ঝিক মারত যে, মাইল-টাক দূর থেকে মালুম হত, ওই হল গো বটেশ্বরের ঘর। রং করার পয়সা ছিল না বলে সেইসব টিন এখন মরচে ধরে ঝুরঝুর করছে। মাটির ভিতেও মাটি আলগা হয়েছে অনেককাল। বিস্তর গর্ত। ডেবেও গেছে কয়েক জায়গায়। বেড়ায় মেলা হোঁদল। উঠোনটার দশাও চোখে দেখা যায় না। মাঝখানটা যাহোক একটু নিকোনো বটে, কিন্তু ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বুক সমান জঙ্গল উঠেছে ঠেলে। ঘণ্টা দুই কোদাল চালালেই সব উঠে গিয়ে ফের ন্যাড়া হয়ে যায় উঠোন। কিন্তু কোদালটা টেনে তুলবেটা কে ? তিনটে ছেলেই কুষ্মাণ্ড। বটেশ্বর তো এক বুক শ্বাস টানতেই নেতিয়ে পড়ে।

চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখল বটেশ্বর। রোজই দেখে। বেলাটা বাড়লে শরীরটাও একটু ছাড়ে। উঠোনের পশ্চিমধারে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বটেশ্বর দেখল, উনুনের জ্বালাই ওঠেনি আজ। নিতাইয়ের মা বোধ হয় পাড়া-বেড়াতে গেল। সদিটাকে দেখা যাচ্ছে না কাছে-পিঠে। পাড়া-বেড়াতেই গেছে বোধ হয়, নয়তো শাকপাতা তুলতে।

চোরের বাড়ি বলেই বোধহয় এ-বাড়িতে চোর আসে না। আর এসে করবেই বা কী? ছুঁচো মারলে নিজের হাতেই গন্ধ। বটেশ্বর তাই দোর খোলা রেখেই বেরোলো।

আজ খুব নিতাইয়ের কথা ভাবছিল সে। ব্যাটা চোর বটে, কিন্তু চুরি করেও বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি আজও। আজকাল তো সোজা বাপের কাছেও বিড়ি আর ম্যাচিসের পয়সা চায়।

তেমন তেমন চোর হতে পারলে চোরের বাপ হয়েও সুখ ছিল। যত লোক লুটেপুটে খাচ্ছে চারদিকে। নিতাই সেসব নয়। সে হল গ্যাদড়া চোর। লোকের ঘটিটা-বাটিটা সরায়। চোরের মারও খায়। দেগঙ্গার তোতারামের মোটর কারখানায় ঢুকে ব্যাটারি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। হাটুরে কিল তো খেলই। তার ওপর আরও পাঁচটা চুরির মামলা ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশ হাজতে চালান দিল। তিন মাসের মেয়াদ হয়েছে তার দুমাস পেরিয়ে তিন মাস চলছে। ছাড়া পেয়ে বাড়ি এলে যে সকলের আহ্লাদ হবে এমন নয়। তবে জেল খাটছে বলে বুকের মধ্যেটায় একটু কেমন করেও যেন। শ্বাসবায়ুটার বড্ড বাধা হয় এক এক সময়ে।

বটেশ্বর তার স্থাবর সম্পত্তি দেখতে একটু বাইরের দিকে এল। উত্তর দিকটায় মেটে রাস্তা, দক্ষিণে জঙ্গল, পুবে গিরিধারীদের বাড়ির হাতা, পশ্চিমে পুকুর। মাঝখানে মেরে কেটে কাঠাপাঁচেক জায়গা হবে। এটুকু বটে নির্যস বটেশ্বরেরই। তা এই অজ পাড়াগাঁয়ে এটুকুরই বা দাম কী? নাবাল জমি। বর্ষায় এক হাঁটু জল হয়।

বাইরে ফর্সা রোদে দাঁড়িয়ে তবু বটেশ্বরের বুকখানা একটু ঠেলে উঠল। অনেকের তো পাঁচকাঠা বাস্তুজমিও নেই। তার চেয়েও মেলা গরিব রয়েছে সংসারে।

জঙ্গলের দিক থেকেই বটেশ্বরের দু নম্বর কুষ্মাণ্ড বেরিয়ে এল। চেহারাটা খারাপ ছিল না। কালোর মধ্যে মিঠে একখানা ভাব আছে মুখে। চোখ দুখানা টানাটানা। তাকালে মায়া হয়। কিন্তু ওইখানেই যত গণ্ডগোল। ওই ড্যাবা ড্যাবা চোখের পিছনে কোনও

মগজের খেলা নেই। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হল, এখনও রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে, খিদে পেলে বাচ্চা খোকার মতো কেঁদে ওঠে, কথাবার্তায় এখনও আড় ভাঙেনি। সে যাহোক এক রকম সয়ে যেত, কিন্তু বিপদ হয়েছে রাস্তায় বেরোলেই গুচ্ছের ছেলেপুলে ওর পিছুতে লাগে। ল্যাং মেরে ফেলে দেয়, ঢিল মেরে মাথা ফাটায়, জামা ছিঁড়ে দেয়, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে দেয়। ছোঁড়া মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে গালমন্দ করে বসলে তখন সবাই মিলে পিটিয়ে হাতের সুখ করে নেয়। দু নম্বরের কথা ভেবেও বটেশ্বরের শ্বাসবায়ুটা কাঁপে মাঝে মাঝে। মারধর বটেশ্বরও কিছু কম করে না বলাইকে। মায়ের হাতে মার খায়, বোনের হাতে মার খায়, ভাইদের হাতে মার খায়, পাড়াপড়শীর হাতে মার খায়। একটা শরীরে আর কত সইবে ওর? মার খেয়েই না একদিন মরে।

আজও খেয়েছে। ছেলেটা একটু কাছে এগিয়ে আসতেই বটেশ্বর দেখতে পেল, মাথার চুল খামচানো, গলায় দগদগে লাল দাগ, গালে কার আঙুল বসানোর দাগ ফুটে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বটেশ্বর রক্তচক্ষুতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। আগে মায়া হত, যারা মেরেছে তাদের ওপর রাগও হত, এমন কি ছেলের হয়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে ঝগড়াও করে এসেছে সে বহুবার। আজকাল আর মায়া হয় না। মনে হয়, মেরেছে বেশ করেছে। মেরেও বোধ হয় ফেলবে একদিন। শিবু আর নন্দর দল হল গাঁয়ের সবচেয়ে গুঁছা। তারা না পারে হেন দুষ্কর্ম নেই। ধুতরো-বিচি আর করবীর গোটা খাইয়ে বলাইকে তারা প্রায় বৈতরণী পার করে দিয়েছিল একবার।

কোথা গিয়েছিলি? বলে বটেশ্বর একটা চড় তুলল। কিন্তু অত বড় চড়টা কষানোর মতো জুত নেই শরীরে। কষালে চড়ের ধাক্কায় যে নিজেই কাটা কলাগাছের মতো ভূমিশয্যা নেবে।

বলাইও চড়টা উঠতে দেখল, কিন্তু গা করল না। ডান হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, মেরেছে।

তা তো হাল দেখেই বুঝেছি। যাস কেন?

খুব মেরেছে।

বাতাসে গন্ধটা শুঁকল বটেশ্বর। ভাল গন্ধ নয়। এই সাত-সকালেই ছোঁড়াকে কেউ ধেনো গিলিয়েছে।

কী খেয়েছিস হারামজাদা ?

নন্দ দিলে যে ! খেতে বিচ্ছিরি। বলল না খেলে জুতোপেটা করবে।

তাই খেলি ?

খেলুম। সঙ্গে বাদাম ছিল।

ওঃ সেই লোভে !

বটেশ্বর কি আর বলবে! ছেলেটার তো খিদেও পায়। খিদে পেলে চেপে রাখতে পারে না। আপনাপর ভেদবুদ্ধি নেই বলে নানা কাণ্ড করে বসে। দোকান থেকে খাবার তুলে খায় বা কারও হেঁসেলে ঢুকে পড়ে পিঁড়ি পেতে বসে যায়, নয়তো কারও পাত থেকেই খাবলা মেরে তুলে খায়। তার জন্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা কিছু কম হয় না। বাড়ি বয়ে এসে কত লোকে অকথা কুকথা বলে যায়।

হ্যাঁ রে, রাস্তার কুকুরে আর তোতে তফাতটা কি তা বুঝতে পারিস ?

বলাই এ কথার জবাব দিল না, বলল, বড্ড পেট গুলোচ্ছে। বমি করব।

যা, ওই পুকুরধারে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে উগরে দিয়ে আয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বলাই টলতে টলতে পুকুরধারে গেল। দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখল বটেশ্বর।

হুস হাস করে উত্তুরে হাওয়া ছাড়ল। রোদটা পিছলে যাচ্ছে গা থেকে। বটেশ্বর খয়েরি খদ্দরের চাদরটা আর একটু সেঁটে নিল গায়ে। তারপর উঠোনে ঢুকে ঘরের আড়ালে হাওয়া বাঁচিয়ে উঠোনের রোদে বসল। সকাল থেকে পেটে খোঁদল। দানা নেই। তবে জল অনেকটা করে সাঁদ করিয়েছে ভেতরে। লাভ হয় না। একটু বাদে বাদে পেচ্ছাপ হয়ে বেরিয়ে যায়। তা এরকম প্রায়ই হয়, গা-সওয়া।

হেলেদুলে সদি এসে উঠোনে এক বোঝা কচুর শাক ফেলে বলল, বাব্বাঃ, মুখ নয় তো, আস্তাকুঁড়। চিঁড়ে কুটে দিলুম সেদিন, আজ একটু চাইতে গেছি, নন্দীবাড়ির গিন্নিমাগী কত কথাই শোনালে।

চিঁড়ের কথায় বটেশ্বর নড়েচড়ে বসে। শব্দই ব্রহ্ম। 'চিঁড়ে' বলতেই নাকে নতুন চিঁড়ের গন্ধ এসে লাগে, জিভটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠতে চায়। বটেশ্বর মেয়ের দিকে জুলজুলে চেয়ে রইল, দিলে না বুঝি।

দেবে। সে আত্মা কি ও-মাগীর আছে? দিয়েছিল তো মোটে পাঁচসিকে পয়সা আর একটা ছেঁড়া কাপড়। তা সে-ই তার দানসাগর।

অত কথা কানে গেল না বটেশ্বরের। সে চিঁড়ের কথা ভাবতে লাগল। আহা, চিঁড়ের মতো জিনিস হয় না। নতুন চিঁড়ের সোঁদা গন্ধখানা যেন একেবারে গন্ধমাদন।

* * *

কচুর রসে গা চিড়বিড় করছিল সদির। কচু ধরলেই তার এ রকম হয়। চুলকে চুলকে ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে যায়। কচু খেলে তার গাল ধরে। তবু ওই কচুই রোজ গিলতে হয়। যেমন গা চিড়বিড় তেমন মন চিড়বিড় করছে চটপটির মতো। রাগের তাড়সে বাজি পটকা ফাটছে মাথায়, চোখে ফুলঝুরির ফুলকি। রাগটা ফেটে বেরোতে চাইছে বলেই নন্দীবাড়ির গিন্নিমাগীর ওপর ঝাল ঝাড়ছে সে। নইলে তার দোষ কী। বিশ্বসংসারে কোন লোকটা কম বজ্জাত? ওই যে উঠোনে বসে মৌজে রোদ পোহাচ্ছে লোকটা—ও হারামজাদা কি কম বজ্জাত? সংসার থেকে গা বাঁচিয়ে কেত্তন গেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিল। এখনও হাঁ করে বসে থাকে কখন বউ-মেয়ে কিছু জুটিয়ে আনবে। আড়াই বিঘে ধান জমি ছিল, কবে পেটায় নমঃ হয়ে গেছে। এখন শুধু মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু আছে। তিন তিনটে হুমদো ভাইকেও কি সইতে পারে সদি? তিনটে তিন রকমের বজ্জাত। রাগ আর রাগে দিনরাত খাক হয়ে থাকে সে। রাগ তার মায়ের ওপরেও—তবে একটু কম।

ঘরে এসে যে ভেজা কাপড়খানা ছাড়বে তার উপায় নেই। মোট

চারখানা শাড়ি মায়ে ঝিয়ে ভাগাভাগি করে পরতে হয়। বাহারী জিনিস নয়। নিতান্তই মিল-এর মোটা কাপড়, ছিরিছাঁদ নেই, সাদা খোলে লম্বা পাড়। সকালেই দুখানা জলধোয়া করে গেছে। শুকিয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ধোয়া কাপড় পরলে মা এসে এমন চেঁচাবে যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। নিয়ম হল, শাড়ি ভেজালে গায়ে গায়ে শুকোও। পরা কাপড়খানা থেকে একটা বিদিকিচ্ছিরি গন্ধ আসছে। কচুর শাক তোলার সময় একটা রোগা পেট পাতলা গরুর লেজ এসে কবার লেগেছিল গায়ে। লেজটা হড়হড়ে গোবরে মাখামাখি। আড়াআড়ি সেই গোবরের দাগ এখনও দগদগ করছে শাড়িতে। থাকগে যাক, শুকোক গায়ে, কে তাকে দেখতে আসছে ?

আসবেও না কেউ দেখতে এ জন্মে। হবেও না বিয়ে। দুগাছা ব্রোঞ্জের চুড়িও দিতে পারবে ওই হাড়হাভাতে বুড়ো শয়তান ? আসল না হোক নকল বেনারসী ? পাত্রের একখানা শস্তা ঘড়ি বা সাইকেল ? খাওয়াবে পনেরো জন বরযাত্রীকে ? তার চেয়ে মুখে মেচেতা ধরুক, চামড়া আরও খসখসে হোক, মাথার চুল থাক উকুনে আর খুসকিতে। এই ভাল সদির। আমগাছ আর দড়ি আছে। একদিন ঝুলে পড়লেই হয়। ঝুলবে ঝুলবে করছে অনেকদিন ধরে মনটা।

ঘরে এসে সদি নড়বড়ে চৌকিতে বসে একা একা ফুঁসছিল।

গায়ের চুলকোনি যত বাড়ছে তত রাগ বাড়ছে সদির, মর মর মর সবাই মর। নন্দীমাগী মর, ভাইগুলো মর, মা মর, বাপ মর, নিকেশ হয়ে যা···

কত লোক লটারি জেতে। গুপ্তধন পায়। সাধু-সন্নিসি এসে তাবিজ কবচ দিয়ে যায়। এই মরুণেগুলোর কপালে তাও জুটলনা কোনোদিন। সকাল থেকে কেবল শুরু হয় আঁদার-পাঁদার ঠেঙিয়ে, মেগেপেতে ভিক্ষে করে পেটের জোগাড় করা।

বুড়ো ভোঁদড়টা কাশছে। এমন কাশি যে মাথা ঘুরিয়ে দিল।

সদি কিছুক্ষণ শুনল, তারপর দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, গলা টিপে কাশি বন্ধ করব, বুঝেছো ?

বুড়োটা সভয়ে মেয়ের দিকে মুখ তুলে চাইল। কথা বলার অবস্থা

নয়। কাশির দমকে নাল গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। গাল গলার রগ কেঁচোর মতো ফুলে আছে।

সদি দাঁতে দাঁত পিষে বলে, দিন-রাত কেবল কাশি আর কাশি। কেন, যাও আরও ফুর্তি ওড়াতে। তেঁতুল চাই, অম্বল চাই, তামাক চাই ঘড়িঘড়ি। এখন কেমন? গলায় খন্তাটা এনে ঢুকিয়ে দেবো এখন?

লোকটা ভয় খেয়েছে। হাত তুলে বুঝি মাপই চাইল। তারপর চাদরে মুখ চাপা দিয়ে কাশি আর দম দুটোই আটকানোর একটা চেষ্টা করল, কোনোটাই পারল না।

সদির মাথাটা পাগল-পাগল। বিড়বিড় করেছিল, এখন চেঁচিয়েই বলল, মর মর মর···

বটেশ্বর একেবারে নাভিমূল থেকে কাশি তুলে আনছে। আজ বোধ হয় জীবনের শেষ কাশি কেশে নিতে চায়। এমন খিল ধরেছে ওকে যে দম টানতে পারছে না। যদি বা টানে নাল গিয়ে শ্বাসনালীতে ঢুকে বিষম খায়।

মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে উবু হয়ে কাশতে লাগল বটেশ্বর। একটা কথাও বেরোলো না মুখ দিয়ে। কিন্তু সদির কথাটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। তাকে মরতে বলছে সদি।

কথাটার জবাবও বটেশ্বরের জানা। সে বলতে চাইছে মরার ফাঁকটাই তো খুঁজছি কবে থেকে। ফাঁকই যে পাই না, তবে ভাবিসনি, কাশির দমকে একদিন কটাং করে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবেই। এ রকম কয়েকটা জম্পেশ কাল-কাশি হতে থাকুক।

কিন্তু কিছু বলাই গেল না।

সদি অবশ্য দাঁড়াল না। তার সারা গা কুটকুট করছে। পাগল পাগল লাগছে। ক্ষিদে মরে গিয়ে মুখে তিতকুটো স্বাদ। কষে ফেনা জমে আছে।

সদি ঘরে এসে একটা আস্ত সুপুরি মুখে দিল। একটা সুপুরি গাছ আছে তাদের। মেলা সুপুরি হয়। খিদে চাপতে হলে সুপুরি খেয়ে

কত বেলা কাটিয়ে দেয়। একটু কাঁচা থাকলে ভাল। নেশামতো হয় তাতে, কাঁচা সুপুরির ধক পেট অবধি অবশ করে দেয়।

সদির দাঁত শক্ত। মাংসের হাড় চিবিয়ে ছাতু করতে পারে। শুধু জোটে না এই যা। সুপুরিটা কাঁচাই বটে। চিবোলে লহমায় তার মজবুত দাঁতে পিষে কাদামতো হয়ে যাবে তাই চিবোলো না সদি, আছে যতক্ষণ থাক।

ঘরে আয়না নেই, কিন্তু পুকুরে জল আছে। সদির এখন একটু নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে। বয়স যে যায়। যৌবন এল বটে, শরীরে বসবার জায়গাই পেল না। তেমন ঠেলে উঠল না বুক, ভারী হল না উরু, কেমন সব দড়ি পাকিয়ে রইল, গুটি পাকিয়ে রইল। কাঁচের চুড়ি অবধি জোটানো যায় না। আর জোটালেও, রাখতে পারা কি সোজা? কাপড় কাচো, কাঠ টুকরো করো, বাসন মাজো, বেড়া বাঁধো। কাঁচের চুড়ি কি অত ভর সয়? পটাপট ভাঙে। ওসব বিবি-হাতের জন্য, তার মতো ওঁছা মেয়েদের হাতের জন্য নয়।

সদি সাজে না ঠিক কথা, কিন্তু কখনো সখনো দু-একজন বলে ফেলে, সে দেখতে নাকি মন্দ নয়। তাই একটু দেখতে ইচ্ছে যায় নিজেকে মাঝে মাঝে।

বটেশ্বর আর কাশছে না। রোদের দিকে হাঁ করে বসে আছে। ওভাবেই গলা অবধি রোদ সাঁদ করিয়ে ভিতরটা সেঁকে নেওয়ার চেষ্টা করে বটেশ্বর, সদি জানে। সেঁক তাপ আর দিচ্ছে কে?

সদি রান্নাঘরে ঢুকে লক্ষ্মীছাড়া চেহারাটা একবার দেখল। নিবন্ত উনুনের পাশে হাকুচ কালো মেটে ভাতের হাঁড়ি বিড়ের উপর একটু কেতরে আছে। ঢনঢন। মালসায় একটু নুন পড়ে আছে। অ্যালুমিনিয়ামের চারখানা তোবড়ানো থালা আছে পড়ে। রাতে চালভাজা খেয়েছিল তিনজনে। কানাই ফেরেনি, তবে তারটাও বাড়া ছিল, মা তুলে রেখেছে কানাইয়ের ভাগ। একটা কড়াই উনুনে বসানো, তাতে খানিকটা জল। কিছু আনলে সেদ্ধ হবে বলে কাজ এগিয়ে রেখে গেছে সদির মা। এ রান্নাঘরে বেড়ালও ঢোকে না।

ভারী রাগের মুখ করে সদি চেয়ে রইল। তারপর থালা ক'খানা তুলে নিল। ঘাটে গিয়ে ধুয়ে আসবে। ভাতের এঁটো নয়, তবু ধোয়ার নিয়ম।

সুপুরিটা দাঁতের চাপে তিন টুকরো হয়েছে। মুখ ভরে গেল কাঁচাটে সুপুরির তিতকুটে রসে। গলায় ধক লাগছে খুব। মাথাটা ঝিন্‌ঝিন্ করছে।. নেশাটা ভারী ভাল লাগে সদির। সুপুরির ধক তার রাগটাকে খেয়ে নিচ্ছে।

যখন উঠোন পেরোচ্ছিল তখন বটেশ্বরের মুখের সামনে কয়েকটা মাছি ভন্ ভন্ করছে। বটেশ্বর নির্বিকার। হাঁ করে গলার ভিতরে রোদ ঢোকাচ্ছে। পিছনে ভর দিয়ে চিতিয়ে আছে একটু, চোখ বোজা। চোখের কোল জলে ভরে আছে।

একবার বাবা বলে ডাকতে ইচ্ছে হল সদির তারপর ভাবল, থাকগে মরুকগে।

জামতলায় বদ্রী দাঁড়িয়ে আছে। ওই। কোমরে ঠেস দেওয়া সাইকেল। ভারী রোগা আর ফচকে। সদিকে দেখলেই চোখ নাচিয়ে বলে "হবে নাকি ?"

কী হবে তা অবশ্য বলে না। কিন্তু কুপ্রস্তাব বুঝতে পারে না এমন মেয়ে কে-ই বা আছে ?

সদি বরাবর মাথা নামিয়ে নেয়। যৌবন বৃথা চলে গেল। মাঝে মাঝে ইচ্ছে যায়, শোধ তুলতে বদ্রীকে বলে দেয়, হবে। না হবেই বা কেন ? এর চেয়ে বেশী আর কীই বা কেলেঙ্কারি হবে তাতে ?

বলা যায় না, বদ্রীর দল একদিন টেনেও নিয়ে যেতে পারে তাকে। ওর পেছনে নন্দ আছে, শিবে আছে। ষণ্ডা গুণ্ডা সব. ছেলে-ছোকরা। কোথা থেকে পয়সা পায় কে জানে। মদ খায়, সিগারেট খায় হাতে ঘড়ি বাঁধে। সদি শুনেছে, ওদের মেয়েমানুষও আছে।

তবু কেন যে বদ্রী মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ নাচায় তা কে বলতে পারে ?

জামতলার পাশ দিয়েই সরু রাস্তা ? আড়চোখে একবার কলির

কেষ্টকে দেখে নেয় সদি। বদ্রী আজ চোখ নাবাল না। তবে তাকে চমকে দিয়ে বলল, অ্যাই, বলাইয়ের কী হয়েছে রে?

সদি থামল, বলাইয়ের আবার কী হবে। ঘরে নেই তো।

পুকুরঘাটে যা। ডুবে যাচ্ছিল, ক'জন মিলে তুলেছে। মৃগী নেই তো!

সর্বনাশ!

সদি হরিণের বেগে দৌড়োলো।

তিন-চারজনে মিলে বলাইকে তুলে এঁটেল মাটির ওপর শুইয়েছে। কাদাগোলায় আর মনুষ্যাকৃতি নেই বলাই, ঠিক যেন একমেটে একটা মূর্তি। চুল অবধি থকথকে কাদায় মাখামাখি। হাঁ করা মুখ দিয়ে ফুক ফুক করে জল উথলে বেরোচ্ছে।

সদি কাঠ হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে। শুধু হাত থেকে চারখানা থালা খসে পড়ল।

ঘরামি বীরেশ্বর মুখ তুলে দেখল সদিকে। বলল, খুব টেনেছিল শালা। তাতেই মরণ লেখা ছিল।

সদি নড়ল না। তার হাতে পায়ে সাড় নেই।

শান্তি কয়াল সদির দিকে চেয়ে বলল, আমিই আগে দেখলুম কি না, জলেও আমিই প্রথম লাফিয়েছি। কিন্তুক, এ যে সেঁতিয়ে যাচ্ছে, যেন চায়ে ডোবানো বিস্কুট!

* * *

গলা ফেঁসে গিয়েছিল দ্বিতীয় সিনের আগেই। তা ফাঁসবারই কথা। কানাই তো আর মণ্ডলমশাইয়ের পেয়ারের লোক নয়। সে মাল বয়, ফরমাশ খাটে, পা দাবায়, এত সব করে দু নম্বর সীনে তিন মিনিটের একখানা অন্ধ ভিখারির গান গেয়ে হেঁটে যায়। বাঁধা তিন মিনিট, ব্যস পার্ট ওখানেই খতম।

কিন্তু কানাই জানে তার গলা ভাল। মিষ্টি গলা। যত্নআত্তি করলে এই গলা দিয়ে সুরের সঙ্গে ঝকাংঝক টাকাও ঝরে পড়বে। কিন্তু যত্নআত্তি করবে কি করে? একখানা কমফরটারই জোটানো

গেল না আজ অবধি। মায়ের পুরনো শাড়ির ছেঁড়া একখানা পাড় গলায় সময় সময় জড়িয়ে রাখে। পরশু কুঞ্জনগরে পালা ছিল। সীতার বনবাস। জমে গিয়েছিল খুব। কানাই গাইলও ভাল। তবে ক্ল্যাপ পড়েনি। ক্ল্যাপ সব হাতিয়ে নিল মহীন পাল। গায় ভাল। ওস্তাদি গলা। তার গানে ক্ল্যাপ মারতে মারতে লোকের হাতে ব্যথা।

মণ্ডলমশাইয়ের হাঁটুতে ব্যথা বাত। প্রতি রাতে কানাইকে দিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ দাবিয়ে নেয়। কানাই দাবায় আর দাবায়। মণ্ডলমশায়ের নাকের ডাক উঠলে সে পায়ের কাছেই পড়ে থাকে একখানা চট বিছিয়ে। তাতে আর যাই-হোক, রাতটা দিব্যি চারখানা দেওয়ালের মধ্যে কেটে যায়।

পরশু রাতে মণ্ডলমশাইয়ের অন্য রকম ব্যথা উঠল। খাওয়ার পর "কইরে কানাই হাঁক শোনার জন্য যখন কান পেতে আছে কানাই তখন মল পরা দুখানা পা ঝুমুর ঝুমুর করে মণ্ডলমশাইয়ের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সারা রাত দরজা বন্ধ।

দোষঘাটের কথা হচ্ছে না। মণ্ডলমশাইয়েরও তো আমোদ আহ্লাদ আছে। মধু হাজরা শুধু চাপা গলায় বলল, আসছে পালার হিরোহিন হবে।

কে বল তো ?

চম্পাদাসীর মেয়ে। খারাপ মেয়েছেলে, তবে উদয়পুরের সাহাবাবুদের মেজো ছেলে তপন সাহার রাখা ছিল। তারই মেয়ে। নাম শুনেছিলুম লক্ষ্মী।

এতে কানাইয়ের কিছু গেল এল না। তবে তাকে শুতে হল চার দেওয়ালের বাইরে। বারান্দায়। কুঞ্জনগরের ব্যবস্থা ভাল নয়। ছোট্ট একখানা ক্লাবঘরের দুটো কুঠুরিতে বন্দোবস্ত। একটাতে মণ্ডলমশাই। অন্যটাতে তারা গাদাগাদি এতগুলো লোক। কানাইয়ের জায়গা হল না।

বারান্দায় শুয়ে গলাটা গেল। সকাল থেকেই বসা-বসা ভাব। বিকেলে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। দ্বিতীয় সীনে তার নামবার কথা। বাদ

পড়লে নবহরির পোয়াবারো। সে তো ঢোকার জন্য মুখিয়েই আছে। কানাইয়ের কপাল তো ওই তিন মিনিটের জন্য খোলে। সে তাই গলার কথা চেপে গিয়ে নেমে পড়ল আসরে।

তারপর গলা দিয়ে যা বেরোলো তা গাধা আর বেড়ালে মেশালে যা হয়। একেবারে কেলেংকারির একশেষ। কানাই যত গলা তুলতে চায় গলা তত টেনে নামায় তাকে। হাসি টিটকারির হল্লা বয়ে যেতে লাগল চারধারে। ভাল গাইলে এরা তার সীনে হাততালি দেয় না কখনো, কিন্তু টিটকারির বেলায় রস দেখ।

মণ্ডলমশাই কম কথার মানুষ। কথার ধার দিয়েও গেলেন না অবশ্য। চটিপরা একখানা পা তুলে মাজায় একখানা লাথি কষিয়ে আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

কানাই চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। মধু হাজরা একটু নেকনজরে দেখে তাকে। বলল, পা দুখানা যদি চেপে ধরে পড়ে থাকতে পারতিস।

ধরব গিয়ে এখন?

পাগল! লগ্ন পার করে দিলি। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে কয়েকদিন জিরিয়ে নে। সাগরদিঘিতে আসর বসবে সাত তারিখে। ওখানে গিয়ে জুটিস। আমি মণ্ডলমশাইকে ভিজিয়ে রাখবখন।

ভিজবে।

সে তোর বরাত। লক্ষ্মী দাসীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি হচ্ছে, হতে দে। এ সময়টায় মেজাজ একটু টং থাকে। বুড়ো বয়সে ছুকরিকে সামাল দিতে অনেক মেহনত রে, তুই বুঝবি না। এখন হবে না।

কানাই কাটল।

কুঞ্জনগর জায়গা ভাল নয়। লোকগুলো কেমন যেন ডাকাতে চেহারার। তার চেয়েও ভয়ের কথা হল কুকুর। রাস্তার কুকুর দিনের বেলায় ভালমানুষটি, ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। রাতে এক-একটি বাঘ। তখন তারা জোট বেঁধে তাড়া করে।

কানাইকে বেরোতে হল রাতেই। বেশ নিশুতি রাত।

চারিদিকটা কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় একেবারে দুধমুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। কানাই একটু দৌড়-পায়েই হাঁটছিল। আজ রাতটা পড়ে থাকতে পারত বারান্দায়। কিন্তু মণ্ডলমশাই যা ক্ষেপেছেন তাতে ভরসা হয় না। আসর আজ একেবারে মাটি। বদনাম হয়ে গেল খুব।

শীতলাথানের কাছ বরাবর কুকুরে ধরল কানাইকে। অন্তত দশবারোটা হবে। কুকুর না বাঘ কে বলবে! আর গলার জোরও বটে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে চেঁচানির চোটে।

কানাই একখানা দৌড় মারবে কিনা ভাবল। কিন্তু কুকুরের স্বভাবগতিক সে খানিকটা জানে। দৌড়োলেই পিছু নেবে আর ছিঁড়ে খাবে।

কানাই তাই কুকুর-ঘেরা হয়ে দাঁড়িয়ে ধমকচমক করতে লাগল। কিন্তু ভাঙা গলায় ধমকও খুলছে না। গলায় গাধা আর বেড়ালের মিশেল ছিল। এখন বুঝল, গলা থেকে গাধাটা সটকেছে, শুধু বেড়ালের ম্যাও ম্যাও বেরোচ্ছে। ওতে কুঞ্জনগরের বাঘা কুকুরদের ভয় খাওয়ার কথা নয়। তারা বরং আরো দু কদম চেপে এল এবং তার মুখের দিকে চেয়ে এমন বকাঝকা করতে লাগল যে মণ্ডলমশাই অবধি লজ্জা পেতেন।

রাতের খাওয়াটা মার গেছে। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। পকেটে পয়সা নেই, বিড়ি নেই, দেশলাই নেই। এত 'নেই'-এর মধ্যে পড়ে গেছে কানাই যে, সে নিজেও আছে কিনা তাইতেই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। ভাবতে ভাবতে চোখটা ভিজে উঠল তার। মাজায় এখনো মণ্ডলমশাইয়ের লাথিটা কন কন করছে।

কুকুর-ঘেরা কানাই উবু হয়ে বসল। তারপর বলল, খা বাবারা, খা। নিকেশ করে দে।

তাকে উবু হয়ে বসতে দেখে কুঞ্জনগরের বীর কুকুরেরা ভড়কাল। লোকটার ভাবগতিক তাদের সুবিধে ঠেকছে না। তারা কয়েক পা পিছোলো। আরও কিছুক্ষণ তড়পাল।

কতক্ষণ এভাবে থাকতে হত কে জানে। হঠাৎ গোটা পাঁচেক ডাকাতে চেহারার লোক লাঠি হাতে যেন আকাশ থেকেই নেমে এল।

কে র‍্যা ওখানে? কী মতলব? অ্যাঁ!

কানাই উঠতে গিয়ে দেখল হাঁটুতে খিল ধরে গেছে, ঝিঁঝিতে পা দুখানা অবশ। সে বলল, আজ্ঞে কোনও মতলব নেই, এমনি বসে আছি···

কিন্তু কথাগুলো কুকুরের ডাক ছাপিয়ে লোকগুলোর কান অবধি গেল না। গলার এখন সেই ক্ষমতা নেই। গলায় যতক্ষণ গাধাটা ছিল ততক্ষণ তবু একটু ভরসা ছিল। এখন একা বেড়ালটা সুবিধে করে উঠতে পারছে না।

লোকগুলো লাঠি তুলতেই কুকুরগুলো তফাত হল। তবে খুশি হয়ে নয়। এমন একটা বীরত্ব দেখানোর মওকা ফসকে যাচ্ছে তাদের।

লোকগুলো কত লম্বা তা খিদে আর ভয়ের মুখে হিসেব করতে পারল না কানাই। তবে বসা অবস্থায় মুখ তুলে তার মনে হল, তালগাছ প্রমাণ হবে এক-একজনের আকার। মুখে একটা নিবু নিবু টর্চের হলদেটে আলো এসে পড়ল।

অ, এই সেই লোক। তুফান অপেরার গানাদার। তা এখানে কা মনে করে হে?

কানাইয়ের একটু দেমাকও হল, একটু রাগও হল। দেমাক, কেন না লোকে তাকে দেখেই চিনে ফেলছে। আর রাগ, তার বসে থাকা নিয়ে অত খতেন কিসের? লোকে কি একটু ইচ্ছেমতো বসেও থাকতে পারবে না নিরিবিলিতে? কোনও আইন আছে নাকি?

যখন উঠে দাঁড়াল কানাই তখন অবাক হয়ে দেখল, লোকগুলো মোটেই তালগাছের মতো লম্বা নয়। তারই সমান সমান হবে। গায়েগতরে অবশ্য দশাসই। কুঞ্জনগরের লোক বোধ হয় খায়দায় ভাল।

সামনেই গোঁফওয়ালা একটা লোক। বলল, কী হে, তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

কানাই কথাটার সোজা জবাব দিল না। বলল, ফের পায়ে ধরে সেধে আনবে। না এলে উপায় আছে!

সেই ম্যাও ম্যাও বেরোচ্ছে গলা দিয়ে, টাগরা জ্বালা করছে। চোখে যেন লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছে কেউ। না, ঠাণ্ডাটা বেশ জমিয়েই লেগেছে তার।

লোকটা তেমন তেড়িয়া নয়। তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, যাত্রাদলের ওইটেই বিপদ, বুঝলে! আজ রাজা কাল ফকির। তা বলতে নেই বাপু, তোমার গানখানা আমার বেশ ভালই লেগেছিল। কী বলিস রে পদ?

পদ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, গলায় মাল আছে। তা গলাখানা বসালে কীভাবে বাপ!

সে অনেক কথা। গলা বসার পিছনে লক্ষ্মীদাসী আছে, মণ্ডলমশাই আছেন, আছে কানাইয়ের পোড়া কপালও। কিন্তু অত কথা এই গলায় সাপটে ওঠা মুশকিল।

গোঁফওয়ালা বলল, তা রাতবিরেতে কোথায় বেরিয়েছো? কুকুরে ছিঁড়ে খেত যে। রাস্তাঘাটও সুবিধের নয়। যাবে কোথা?

বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলুম আজ্ঞে। মাইল পাঁচেক পথ হবে।

আরে দূর, পাঁচ মাইল ঠেঙাতে যাবে কোন্ দুঃখে? তুমি গুণী মানুষ, চলো রাতের মতো একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

ভগবান যে আছেন এ কথাটা মাঝে মাঝে কানাইয়ের মনে হয়। তবে কিনা ভগবান থাকলেও তাদের মতো মনিষ্যির জন্য নয়। এই যেমন মণ্ডলমশাইদের ভগবান আছেন, তাদের গাঁয়ের নন্দীদের জন্যও ভগবান আছেন। এই সব গুরুতর লোকদের মধ্যে ভগবান ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়ে তাদের ভাগে আর ভগবান পড়ে থাকেন না। একা মানুষ তিনি কত দিক সামলাবেন? তবে মাঝে মাঝে এক-একটা এমন কাণ্ড হয় যে, ভগবান হঠাৎ মাছের মুড়ো হয়ে পাতে এসে পড়েন, কখনও বা নতুন একখানা লাল গামছা হয়ে কাঁধে এসে এলিয়ে থাকেন, কখনও বা মণ্ডলমশাইয়ের থলি থেকে টাকাটা সিকেটা হয়ে তার হাতে

এসে পড়েন। এরকম কাণ্ড ন'মাসে ছ'মাসে ঘটে বটে, কিন্তু তখন কানাই ভগবানকে ঠিকই টের পায়। নইলে ফুলপুরে পালা গাইতে গিয়ে ওই কাণ্ড ঘটে ? সাতটা পাত পেরিয়ে এসে তার পাতেই কেন মুড়োখানা ফেলল লোকটা ? গামছাখানার বৃত্তান্ত অবশ্য অন্য রকম। বরুর হাটে গামছার কারবারী হরিহর সাঁপুই তার মায়ের শ্রাদ্ধে কীর্তনীয়াদের একটা করে দিয়েছিল।

ভগবান যে আছেন তা জ্বলজ্যান্ত আজও টের পাচ্ছে কানাই। সামনে পিছনে গোটাকয় লাঠিধারী তাকে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলোও আসছে বটে পিছু পিছু তবে তাদের আর সেই তেজ নেই। একেবারে চাকরবাকরের মতো অবস্থা।

গুঁফো লোকটার অবস্থা ভাল। বিষয়ী গেরস্ত লোক। গোটা পাঁচসাত ঘর আছে উঠোনের চারধারে। ধানের মরাই আছে। গোয়াল আছে। রান্নাঘর থেকে সেদ্ধ ডালের গন্ধও আসছে।

'বোসো' বলে ঘরে নিয়ে একখানা মোড়া ঠেলে দিল তার দিকে। কানাই বসে পড়ল। লেঠেলরাও সব বসে গেল চারদিকে। বোধ হয়, রাত পাহারা দেয় সবাই।

গুফো বলল, আর বোলো না হে, বড্ড ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছে। সাঁজবেলা থেকেই আমরা তাই তক্কে তক্কে থাকি। মাসটাক আগে তিনটেকে ওই শীতলাতলাতেই পিটিয়ে মেরেছি। তাইতেও কি দমে ? তবু আসে। তা তোমার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে কিছু খাওটাওনি ! খাবে কিছু ?

গলার বেড়ালটাও যাই-যাই করছে। গলার ওপর ভরসা রাখল না কানাই। তবে ঘাড়টা এমন হেলাল যে আর একটু হলেই মাথাটা খসে পড়ে যেত ঘাড় থেকে। বেশী করে না হেলালে যদি লোকটা ভুল বোঝে সেই ভয়টাও তো আছে।

তাহলে বসি গে ভিতরবাড়িতে। আর ওই একটা খাটিয়া আছে, লেপও পাবে। খেয়ে শুয়ে পড়ো। ও আমার ঠাকুর্দার বিছানা। এই মাস দুই হল গত হয়েছেন।

ভগবান আজ গরম ভাতে ভাজা মুগের ডাল হয়ে, আলুপোস্ত হয়ে, চুনো মাছের চচ্চড়ি হয়ে, ডালের বড়া হয়ে নেমে এলেন ধরাধামে। পেটের রাক্ষস বধ হয়ে গেল লহমায়। ভগবান তারপর বিছানা হলেন, লেপ হলেন, তারপর ঘুম হয়ে চেপে বসলেন কানাইয়ের চোখের ওপর। মণ্ডলমশাইকে ডেকে এনে যদি দেখানো যেত কাণ্ডটা!

* * *

কুঞ্জনগরের কুকুরদের চিনল হাড়ে হাড়ে নিতাইও। এখনও সড়গড় হল না তার অনেক কিছুই। অন্ধকারে অচেনা ঘরে সে হোঁচট খায়, ধাক্কা খায়, হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে যায়, হাঁচি বা কাশি পেয়ে বসে। সে তো গেল ঘরে ঢুকবার পরের কথা। তার আগে আছে কুকুরের ল্যাঠা। কুকুর বরাবরই ছিল, চোরও ছিল। কস্মিনকালে কেউ শোনেনি যে রাস্তার কুকুরের সঙ্গে চোরের আড়াআড়ি আছে। এও ওকে চেনে, ও-ও একে চেনে। কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু কপালদোষে নিতাইকে মাথা ঘামাতে হয়।

হাড়ভাঙা খাটুনি ছিল বটে, কিন্তু জেলখানা জায়গাটা মোটেই খারাপ ছিল না। দুবেলা খাবার জুটত। ঘুম হত দিব্যি। পাঁচজনের সঙ্গে পাঁচ রকমের সুখ দুঃখের কথা হত। সময়টা জলের মতো কেটে গেল। তিন মাসের মেয়াদ কোন আদিখ্যেতার হিসাবে কমে গিয়ে দু মাসে দাঁড়াল। হপ্তা দুই হল ছাড়া পেয়ে নিতাই এখন সত্যিকারের জেল খাটছে। জেল খাটা ছাড়া আর কী? সময়ে অসময়ে খিদে চাগাড় দেয়, রাতবিরেতে আস্তানা খুঁজতে হয়, কুকুরের ভয়, সাপখোপের ভয়। নিতাইয়ের তো মনে হয়, জেলখানা দিব্যি জায়গা ছিল। আবার ধরা পড়তে নিতাইয়ের আপত্তি নেই। তবে কিনা গাঁ-গঞ্জে পুলিস তো আর হাতের মোয়া নয়। মাইল মাইল জুড়ে পুলিসের ছায়াটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আর আজকাল গাঁয়ের লোকগুলোও হয়েছে ভারী বজ্জাত। ধরতে পারলে পুলিসটুলিস ডাকে না, নিজেরাই কিলিয়ে নিকেশ করে দেয়। নিতাইয়ের যা অবস্থা, আড়াইটে কিলও হজম হবে না।

হপ্তা দুয়েক ধরে গ্রহের ফের চলছে। হাত এখনো পাকেনি। ভয়ডর আছে। সঙ্কোচ আছে। চক্ষুলজ্জা আছে। এত সব গেরো থাকলে পেট চালানো দায়। তবু নিতাই চেষ্টা করেনি তা নয়। চরণগঙ্গায় মাধব কুণ্ডুর বাড়িতে সিঁধ দিয়েছিল। মাধব কুণ্ডুব মেলাই টাকা। বাড়িতে মালপত্রও মেলা। কিন্তু তার বাড়ি পাকা। সিঁধ দিতে হলে মাটির ভিটে ছাড়া সুবিধে নেই। মাধব কুণ্ডুর মাটির ভিতের একখানা মেটে ঘর আছে। সেখানে সেঁদিয়ে নিতাই পেল কিছু পুরোনো শিশিবোতল. কিছু লোহালক্কড়, কিছু কাঠের তক্তা। কপালটাই খারাপ। কষ্টেসৃষ্টে একখানা তক্তাই সরাল নিতাই। বেশ ভারী। মাথায় বয়ে মাইল তিনেক হেঁটে তবে এক জায়গায় চার টাকায় বিক্রি করল।

সোনাচরের এক বাড়ি থেকে এক টিন গুড় সরিয়ে ফেলে ট্যাঁকে এল আটটি তঙ্কা। এইভাবেই চলছিল। আলায় বালায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এ জায়গায় এসে শুনল জায়গাটার নাম কুঞ্জনগর। নামটা চেনা। তা ছাড়া, মাথায় একটা কথা টিক টিক করে জানান দিচ্ছিল। হারাধন নস্করের মেয়াদ হয়েছিল সাত বছর। বছর দুই মোটে কষ্টেসৃষ্টে কেটেছে। বাকি মেয়াদটা কাটানোব কথা নয়। তাকে মরুনে রোগে ধরেছিল। নিতাই তার খুব দেখাশোনা করত জেলখানায়। যেদিন হারাধনকে হাসপাতলে নেওয়ার কথা তার আগের রাতেই হঠাৎ বাড়াবাড়ি হল খুব। বুকে ব্যথা, তার মধ্যেই হাঁসফাঁস করতে কবতে নিতাইকে বলেছিল, কুঞ্জনগরেব চণ্ডীতলায়— বুঝলি···চণ্ডীতলায়···আছে সব। মেলা জিনিস···

রাতটা কাটেনি হারাধনের।

এই সেই কুঞ্জনগর। চণ্ডীতলাও বেশী খুঁজতে হয়নি। একখানা পুরোনো পোড়ামাটির মন্দির আছে। ভিতরে চণ্ডীর মূর্তিও আছেন। চারধারে নানা আগাছা, এঁদো পুকুর, ফাঁকা জমি। এখানে কী আছে—কোন গুপ্তধন তা কে জানে। চাপেটোপে জায়গাটা পবখ করেছে নিতাই। কোনো লক্ষণ ধরতে পারেনি।

কোনও গাঁয়ে বাইরের লোকের গা-ঢাকা দিয়ে থাকা মুশকিল। তবে সুবিধে হল কুঞ্জনগরে দু দিন হল একটা যাত্রার দল এসেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে সে বলে দিচ্ছে যাত্রাদলের লোক। বাঁচোয়া।

আজ রাতের দিকে নিতাই চণ্ডীতলায় হানা দিয়েছিল। রাত ছাড়া সুবিধে নেই। কিন্তু কুঞ্জনগরের হারামজাদা কুকুরদের সে চিনত না। কোথাও কিছু নেই, দিব্যি গটগটিয়ে গিয়ে সে চণ্ডী মন্দিরের দরজার কব্জা আলগা করছে, এমন সময় খা-খা করে যমদূতের মতো কুকুরেরা তেড়ে এল।

নিতায়ের আর কিছু না থাক, হাতে পায়ে চটপটে ভাবটা আছে। সে এক লম্ফে নেমে দৌড় যা একখানা মারল, কুকুরেরা পর্যন্ত অবাক। দম ধরে খানিকটা দৌড়ে, ফের কিছু আঁকাবাঁকা হয়ে সে এক জায়গায় থামল। একটু জিরিয়ে নিল। তারপর ঘরখানা নজরে পড়ল তার। একেবারে নাকের ডগায়, জ্যোৎস্নায় হাসছে। আয়-আয় করে ডাকছে। আহা! কী ঘর। মাটির নরম ভিত। দেখলেই বোঝা যায়, ভিতরে মাল আছে।

নিতাই কাজে লেগে পড়ল।

ভজঘট্ট বাঁধল মোড়াটা। ব্যাটাচ্ছেলে পায়ে লেগে কেৎরে একেবারে রেলগাড়ির মতো গড়িয়ে গিয়ে গদাম করে লাগল একটা লোহার ড্রামে একেবারে বাজপড়ার শব্দ।

একটা থুপথুপে ভুতুড়ে গলায় কে যেন বলে উঠল, কে!

একটু ভড়কে গিয়েছিল নিতাই। এমন শব্দ শোনেনি কখনো। মানুষের গলায় বটে তো! সে পিছিয়ে সিঁদের গর্তে সেঁদিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। কপালটাই খারাপ।

সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফটা সামলাচ্ছে ঠিক এমন সময়ে নিবু-নিবু একটা টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে। ঘাড়ের ওপর এক ঘা লাঠি।

নিতাই তাতেই বসে পড়ল। হাতজোড় করে বলল, পেটে দানাপানি নেই, মারলে মরে যাব। ধরা তো দিচ্ছিই, বরং পুলিসে দিন।

গুঁফো একটা লোক কোমরে লাথি কষিয়ে বলল, পুকুরধারে গর্ত খোঁড়া আছে। তোকে মেরে সেখানেই পুঁতব।

আজ্ঞে ও কর্মটি করবেন না। আমি যাত্রাদলের লোক। সকালেই আমার খোঁজ হবে।

যাত্রাদলের লোক! বলে সবাই মুখ তাকাতাকি করল।

গুঁফো বলল, যাত্রাদলে কি মড়ক লেগেছে নাকি! সব খসে পড়ছে যে! তা তোমাকে তো পালায় দেখিনি বাপ।

আজ্ঞে, আমি মেক-আপ করি।

দাঁড়াও, যাত্রাদলের আরও একজন আছে। তাকে ডাকছি। তার আগে বলো তো বাপ, যাত্রাদলের লোক হয়ে সিঁধ দিলে কেন?

যাত্রাদলের একজন এখানে আছে শুনে নিতাইয়ের হয়ে গেল। সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, থানা কতটা দূর হবে বলতে পারেন? না হয় হেঁটেই যাব।

সবাই ফের মুখ তাকাতাকি করতে থাকে। এর মধ্যে একটা লোক এগিয়ে এসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে, কই দেখি।

ফের মুখে টর্চের আলো। গুঁফো জিজ্ঞেস করে, কী হে চিনতে পারছো?

নিতাই মুখখানা নববধূর মতো নামিয়ে ফেলেছিল। বিড়বিড় করে বলছিল, দেশে আইন আছে, মারধর করাটা কি ভাল? পাপ হবে যে!

ফ্যাসফাঁসে গলা হঠাৎ বলে ওঠে, আজ্ঞে ছিল। দাগী চোর। তবে গুণী লোক বলে মণ্ডলমশাই ছাড়েননি। পুরোনো অভ্যেসবশে করে ফেলে চুরিটুরি। তবে আবার মাল ফেরতও দেয় শুনেছি।

গুঁফো লোকটা সমেত সবাই অবাক হল। এমন কথা তারা জন্মে শোনেনি। চুরির মাল ফেরত দেয়! এর তো পায়ের ধুলো নেওয়া লাগে।

নিতাই ভাল করে বুঝতে পারছিল না কিছু। একটা গণ্ডগুলে ব্যাপার হচ্ছে, এইটুকু যা বুঝতে পারছে। যা শুনছে তা ভুল শুনছে কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার।

কানাইকে চিনতে আরও একটু সময় লাগল তার।

গুঁফো আর তার দলবল একটু পরামর্শ করে বলল, ওহে, তোমরা কেউই লোক সুবিধের নও! ব্যাপারটা আমাদের ভাল ঠেকছে না। তবে মানে মানে যদি বিদেয় হও তাহলে এ যাত্রায় কিছু আর বলছি না। ওরে পদ, এ দুজনকে ঘাট পার করে দিয়ে আয়।

* * *

খরচার খাতা থেকে জমার খাতায় ফিরতে বলাইয়ের বিস্তর মেহনত গেল। পাক্কা একটি দিন সে চায়ে ভেজানো বিস্কুটের মতোই নেতিয়ে রইল। এমন ঝিম মারল যে তার মা মাঝে মাঝে নাকের সামনে সুতো ধরে শ্বাস চলছে কিনা দেখে নিচ্ছিল।

তবে হ্যাঁ, পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল বলেই বলাইয়ের খাতিরও বাড়ল খুব। শিবে নন্দর গোটা দলটা কাঁধে গামছা নিয়ে চলে এল। কখন কী হয়, তৈরি থাকা ভাল। ধেনো সে-ই গিলিয়েছিল বলে নন্দ বলাইকে ডলাইমলাইটাও বেশী করল। অনেক জল ওগরাল বলাই। তারপর ঝিম মারল।

শিবে শ্মশানঘাটে যাওয়ার গামছাখান কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে হবেন ডাক্তারকে ধরে আনল।

এ বাড়িতে চোরও আসে না। আজ মেলা লোক। বটেশ্বর কাশতে কাশতেও দৃশ্যটা দেখছিল। হ্যাঁ, লোক হয়েছে বটে। বটেশ্বরেব বেশ একটু খুশি-খুশিই লাগছিল। তাদের ভারী খাতির করছে সবাই।

নন্দী গিন্নি ঝি দিয়ে চিঁড়ে পাঠালেন। একটু আধটু নয়, এক ধামা! সঙ্গে কয়েক ডেলা গুড়। দেখে সদি হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। তবে কান্নাটাই এল। অনেক কথা ভেবে এল। সকালেই 'মর মর' বলে সবাইকে শাপশাপান্ত করেছিল। তা সেই শাপই ফলল কি না কে জানে। হাবাগোবা ভাইটা যদি মরে তাহলে কী হবে?

চিঁড়ের ধামা চৌকির তলায় ঢুকিয়ে রাখল সদি। কে খাবে

এখন ? কার মুখে রুচবে ? অপলক চোখে সে বোকা ভাইটার মরুনে মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল সারা দিন। সারা রাত। বিড়বিড় করে কী বকছে ভাইটা ? জ্বর এল নাকি তড়াসে ?

শিবে দশখানা টাকা ফেলে গেল বলাইয়ের বিছানায়। বলল, কিছু লাগলে কিনে নিস। ওষুধ আমরাই কিনে দিয়ে যাচ্ছি।

কিনে দিয়েও গেল।

বলাইয়ের চেতনা ফিরল পরদিন সকালে। চোখ চেয়েই বলল, মা, খিদে পেয়েছে।

খিদের কথা শুনলে বলাইয়ের মায়ের রক্ত মাথায় চড়ে। সংসারটা সর্বদাই খাই-খাই করে। আজ রক্ত চড়ল না। চোখের জলে ছেলের মুখ ভাসিয়ে মায়ের গলা বলে, খাবি বাবা, অনেক খাবি। পেট ভরে খাবি।

খিদে-পাওয়া আরও দুই মূর্তি এসে উদয় হল দরজায়। কানাই আর নিতাই। মুখে দেঁতো হাসি। কেমন যেন জব্দ চেহারা।

* * *

সব বুঝে সমঝে উঠতে একটু সময় গেল। তারপর সবাই আজ শোওয়ার ঘরে গোল হয়ে বসল। সকলেই পেটেই খোঁদল।

ভেজানো চিঁড়ে আর ডেলা ডেলা গুড় সদি বেড়ে দিচ্ছে থালায়। গপাগপ খাচ্ছে সবাই।

বটেশ্বর খেতে খেতে বলল, বরাবর বলে আসছি আমি, চিঁড়ের মতো জিনিস হয় না।

সদি জলে-ভাস নির্ঘুম জ্বালাধরা চোখে দেখছিল বাপ বটেশ্বর, ভাই কানাই-বলাই-নিতাই আর তার মাকে। মরার বাড়া গাল নেই। না, সে আর কখনও মরার গাল দেবে না বাবা। খুব হয়েছে।

ছাড়পত্র

সকালে মৃদুলা এসে হাজির।

শোন, ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। কাল আমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। অথচ সামনের সপ্তাহেই আমার ফ্লাইট। ছুটিও নেই।

চোখ কপালে তুলে বলি, সর্বনাশ! পাসপোর্ট হারানো তো খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার!

তাই তো তোমার কাছে আসা। এখানে আমার পুরুষ সাহায্যকারী কেউ নেই। তুমি ছাড়া।

আমি মৃদুলার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাবি। আমি ওর সাহায্যকারী, এ কথা ভাবতে আমার একটু কষ্ট হল। মৃদুলার সঙ্গে প্রায় বছর আটেক আগে আমার বিয়ে হয়। অসম বিয়ে। আমি ছিলাম সামান্য সরকারী অফিসার। মৃদুলা তখন সায়েন্স কলেজের দুর্দান্ত ছাত্রী। ফিজিক্সে এম. এসসি. করেছে রেকর্ডভাঙা নম্বর পেয়ে। রিসার্চ করছিল। এমন সময় কানাডা থেকে স্কলারশীপ পেল। বিদেশে যাওয়ার আগেই ওর সেকেলে বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। আর সেই বলির পাঁঠাটি ছিলাম আমি। বিয়ের ছ'মাসের মাথায় মৃদুলা বাইরে চলে গেল, আমি পড়ে রইলাম। স্বভাবতই আমাকে মৃদুলার পছন্দ হয়নি। না হওয়ারই কথা। আমাদের মধ্যে চিঠি চালাচালি কিছু দিন বজায় রইল। তারপর সেই যোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে গেল। এ সবই হয়েছিল অতি স্বাভাবিক নিয়মে। যেন এ রকম হবে বলেই আমারও একটা আঁচ করা ছিল। বিয়ের সময় এবং পরবর্তী ছ'মাসে মৃদুলার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র ঘনিষ্ঠতা হয়নি, শরীরের সম্পর্কও নয়। ওর ঐ দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের জন্যই আমি ওর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেতাম না। আমি বড়ই কাপুরুষ।

কানাডা থেকে বছর তিনেক বাদে একদিন ফিরে এলো মৃদুলা এবং

আমাকে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটিশ দিল। তার আগে অবশ্য আমার কাছে এসে স্নেহভরে আমাকে বোঝাল, এই বিয়েটা জিইয়ে রাখার কোন মানেই হয় না। কারণ, আমরা কেউ কাউকে কোন দিনই পাব না। আমাদের মধ্যে ভালোবাসা বা সম্পর্কের গভীরতাও নেই। সুতরাং আমি যেন মিউচুয়েল সেপারেশনে রাজি হই। বলতে নেই একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মৃদুলাকে আটক করার কোন মানেও তো হয় না। আমি তাই ওর মতে মত দিলাম। আদালত আমাদের বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে দিল।

শুনেছি মৃদুলা কানাডায় এক সাহেব অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। দুজনেই অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত। ভালোই হয়েছে। দুই পড়ুয়ার মিল ঘটেছে। আমার নিজের কপাল অতটা ভালো নয়। মৃদুলা আমাকে পছন্দ না করায় আমি কাপুরুষ হয়ে যাই এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সাহসটুকুও আমার লোপ পায়। বাড়ির লোকেরা এই নিয়ে ঝামেলা করায় আমি বাড়ি ছেড়ে আলাদা একটা ঘর নিয়ে বসবাস করি। এক রকম কেটে যায়। মৃদুলার সঙ্গে অবশ্য বরাবরই আমার চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। আমি একটা চিঠি দিই মাসে বা দু'মাস অন্তর। ওরও ঐ রকম দেরীতে জবাব আসে। আমরা তো পরস্পরকে ঘৃণা করিনি, শুধু ভালোবাসতে পারিনি মাত্র। সেইজন্য আমাদের উভয়ের উভয়ের প্রতি একটা সমবেদনাও ছিল। চিঠি দিয়ে অপরাধবোধ আমরা স্খালন করার চেষ্টা করতাম।

এবারও মৃদুলা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। একটা বিদেশী ছাতা, একটা সোয়েটার আর হাতঘড়ি দিয়েছে। আমি ওকে সিল্কের শাড়ি আর পোড়ামাটির পুতুল কিনে দিয়েছি।

পাসপোর্ট হারানোর খবরে আমি বিচলিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলি, কী করতে হবে বল। যা সাহায্য চাও সবই করব।

ও চিন্তিত ভাবে বলল, এ দেশের থানা পুলিশ খুব কো-অপারেটিভ নয়। তুমি তো সরকারী কাজ কর, তোমার ইনফ্লুয়েন্সে খানিকটা কাজ হতে পারে।

আমি তাড়াতাড়ি প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পোশাক পাল্টে নিতে নিতে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে হারালে ?

ঘর থেকে মৃদুলা জবাব দেয়, বুঝতে পারছি না। কাল অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। ট্র্যানজিশনে ট্যাক্সি বা মিনিবাস বা রাস্তায় পড়ে গেছে বোধ হয়। এ দেশের লোকও ভীষণ ইররেস-পন্সিব্ল। পাসপোর্ট পেলে যে ফেরৎ দিতে হয় তাই হয়তো জানে না।

কথাটা সত্যি। পাসপোর্ট হয়তো অনেকে চেনেও না, পেলে সেটা নিয়ে কী করতে হবে তা মাথায় ঢোকার কথাও নয়। আমি বললাম, খুবই মুশকিল।

মৃদুলদের বাড়ি টালিগঞ্জে। ডিভোর্সের পর ওর মা বাবা ওকে বাড়িতে প্রথম প্রথম ঠাঁই দিত না। এখন দেয়। মানুষ তো সব কিছুই সহ্য করতে পারে। এই সামান্য ব্যাপারটাই বা পারবে না কেন ?

আমরা ট্যাক্সি নিয়ে টালিগঞ্জ থানায় হানা দিলাম।

একজন সাব ইন্সপেক্টর মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনে বললেন, কিন্তু আমাদের এরিয়ায় যদি না হারিয়ে থাকে তবে আমরা ডায়েরী নিই কি করে ?

আমি বিপন্ন মুখে বললাম, তাহলে ?

উনি বললেন, তাহলে লালবাজারে চলে যান। ওরা বলতে পারবে।

গেলাম লালবাজারে। এখানেও একজন গোমড়ামুখো লোক সব শুনে বললেন, আগে কোন থানায় ডায়েরী করিয়ে আসুন। আমরা ডাইরেক্টলি নিতে পারি না।

কোন্ থানায় ?

যে থানার এরিয়ায় হারিয়েছে।

কিন্তু সেটা তো বলা যাচ্ছে না।

মনে করার চেষ্টা করুন।

আবার বেরোলাম। ট্যাক্সিতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোন কিছু মনে পড়ছে না?

মৃদুলা ভ্রূ কুঁচকে বলে, মনে পড়লে তো হয়েই যেত। যদি ট্যাক্সি বা মিনিবাসে হারিয়ে থাকে তবে কোন্ এরিয়ায় হারিয়েছে তা বলব কি করে?

আমি বললাম, তাহলে চল, একটার পর একটা থানায় হানা দিই।

একটু বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে মৃদুলা বলে, তোমার কোন ইনফ্লুয়েন্স নেই? কোন মিনিস্টার বা কারো সঙ্গে চেনা জানা?

আমি যে কত বড় অপদার্থ তা মৃদুলা জানে না। অফিস থেকে ঘর আর ঘর থেকে অফিস ছাড়া আজকাল আমার আর কোন পরিধিই নেই। সে কথা চেপে গিয়ে বললাম, নেই যে তা নয়, তবে এক্ষুণি ঠিক মনে পড়ছে না।

মৃদুলা চুপ করে রইল।

আমরা মুচিপাড়া, কড়েয়া, হেয়ার স্ট্রিট একের পর এক ফাঁড়িতে হানা দিই। কেউ বলল খোঁজ পেলে জানাবে। কেউ অন্য থানায় যেতে পরামর্শ দিল। কেউ বলল, পাসপোর্ট। ও বাবা, ও হারালে জেল। ডায়েরী নিতে কেউ সাহস পেল না।

বেলা যথেষ্ট গড়িয়ে গেছে। মৃদুলা বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। চল, কোথাও কিছু খেয়ে নিই।

আমরা পার্ক স্ট্রীটের কেতাদুরস্ত এক রেস্টুরেণ্টে ঢুকে খেতে বসি।

মৃদুলা মৃদুস্বরে বলল, তুমি কিন্তু হাঁফাচ্ছ।

আমি লজ্জিত হয়ে বলি, আসলে টেনশনটা খুব বেশী তো।

মৃদুলা একটু হেসে বলে, ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হবে। হয়তো সামনের সপ্তাহে যাওয়া হবে না।

তোমার স্বামী চিন্তা করবেন।

তা করবে। তবে ট্রাঙ্ক-কলে ওকে ঘটনাটা জানিয়ে দেব।

আমি উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করি, পাসপোর্ট হারালে কি জেল হয়?

মৃদুলা মাথা নেড়ে বলে, বিদেশে হারালে হয়। এখানে হয়তো

তা হবে না। তবে নানারকম কমপ্লেক্সিটিজ দেখা দেবে। থাকগে, অত ভেবো না তো, তোমাকে এমনিতেই ভীষণ উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তুমি কি শুয়োরের মাংস খাও?

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন?

তাহলে হট ডগ খেতে পারো।

কখনো খাইনি, তবে খেতে আপত্তিও নেই।

তাহলে বলে দিই।

ও বেয়ারাকে তিন চার রকমের খাবারের কথা বলে নিল। তারপর একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, উঃ, আমিও বোধ হয় হাঁফাচ্ছি।

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ।

খেতে খেতে হঠাৎ আমার কানুর কথা মনে পড়ে গেল। ইমপর্ট্যান্ট পোস্টে কত না ঘনিষ্ঠ লোক বসে থাকে। কিন্তু সময় কালে মনে পড়ে না। মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠে বললাম আরে! কানুর কাছে গেলেই তো হয়। ও তো হোম ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারি!

সে কে?

আমার জ্যেঠতুতো ভাই। কানু। আমাদের বাসর ঘরে যে তোমাকে আফ্রিকান জুলু নাচ দেখিয়েছিল বলে তুমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলে। মনে নেই? সেই তো কানু।

মৃদুলা বিরক্তির সঙ্গে বলে, আচ্ছা না হয় হল। আগে খেয়ে তো নেবে।

আমি সে কথায় কান না দিয়ে দৌড়ে গিয়ে কাউণ্টার থেকে রাইটার্সে টেলিফোন করি এবং ভাগ্যক্রমে কানুকে পেয়ে যাই।

কানু! আরে শোন, মৃদুলার পাসপোর্ট হারিয়েছে, ভীষণ বিপদ।

কানু হুংকার দিল, মৃদুলাটা কে?

আরে—ঐযে—সেই মৃদুলা যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল!

বিদূষী ভার্যা! হাঃ হাঃ! তা তার সঙ্গে তোমার এখন কিসের সম্পর্ক?

উই আর ফ্রেণ্ডস। শোন না, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। ও এখানে আটকা পড়ে যাচ্ছে, ওদিকে প্লেনের টিকিট কাটা রয়েছে।

কিছু বুঝতে পারছি না, আরও স্পেসিফিক ভাবে বল।

বললাম, কানু শুনল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর উদাস গলায় বলল, দেখি কী করা যায়।

করা যায় নয়, করতেই হবে। পুলিস চেষ্টা করলে সব পারে।

চেষ্টা করব, পরশু খোঁজ নিও।

আমি ফিরে এসে তৃপ্ত উজ্জ্বল মুখে মৃদুলাকে বললাম, মনে হচ্ছে পেয়ে যাবে। কানুর ইনফ্লুয়েন্স সাজ্ঘাতিক।

মৃদুলা এতক্ষণ চামচ তুলে বসে ছিল। আমি ফিরে আসার পর আবার একসঙ্গে খাওয়া শুরু করলাম। ভারী ভালো লাগছিল আমার। নিশ্চয়ই মৃদুলার পাসপোর্ট পাওয়া যাবে।

* * *

পাওয়া গেলও, পরশু নয়, পর দিনই লালবাজার থেকে একটা জীপ ভোরবেলা গিয়ে মৃদুলার বাড়িতে পাসপোর্ট পৌঁছে দিল।

মৃদুলা অফিসে আমাকে টেলিফোন করে বলল, তোমার ভাই আমার পাসপোর্ট উদ্ধার করেছেন। তোমার ভাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দিও।

আমি উদার গলায় বললাম, আরে ধন্যবাদ-টাদের আবার কি আছে। কানু তো আমার ভাই। পেয়েছ এটাই আমাদের আনন্দ।

মৃদুলা এ কথার কোন জবাব দিল না। ফোন ধরে চুপ করে আছে, টের পেলাম। অনেকক্ষণ বাদে বলল, পাসপোর্টটা না পেলে আমার খুব মুশকিল হত। সে তো ঠিকই।

আমি সামনের সপ্তাহে চলে যাচ্ছি।

সেটা তো আগেই বলেছ।

বলেছি, ও হ্যাঁ, তাই তো।

কালকেই বলছিলে। তোমার স্বামীকে ট্রাঙ্ক কল করেছ ?

না তো! করার দরকার হয়নি। আজই হয়তো করতাম। কিন্তু

পাসপোর্টটা পেয়ে গেলাম যে ! যেন খুব বিপদে পড়েছে এমন শোনাল মৃদুলার গলা।

বললাম, ঠিকই তো, পাসপোর্টটা নিয়ে আর বেরিও না। খুব সাবধানে রেখো। হ্যাঁ, খুব সাবধানে রাখব। আবার হারালে লোকে সন্দেহ করবে, বোধ হয় ইচ্ছে করেই হারাচ্ছি।

কেন ? সন্দেহ করবে কেন ?

আমার নিজেরই যে ও রকম সন্দেহ হয়। বলেই মৃদুলা ফোন রেখে দিল।

কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না। তবে মনে হল, এর চেয়ে ভালো কথা জীবনে শুনিনি।

সময়

সোমনাথের বয়স মাত্র বাইশ। এই বয়সে সব কিছুই বাড়তি থাকে মানুষের। শক্তি, উৎসাহ, আবেগ। সোমনাথ একটি দুর্দান্ত ফাণ্ডাওয়ালা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল একতরফা। মেয়েটির নাম অপরা। আলাপ নেই। পাড়ার সবচেয়ে ঘ্যাম বাড়ি হল চৌধুরীদের। চারদিকে প্রকাণ্ড বাগান, টেনিস লন, সুইমিং পুলওয়ালা বাড়ি। সাতখানা গাড়ি রাখার মতো প্রশস্ত গ্যারেজ। সাতটা বিদেশী কুকুর। এই বাড়ির মেয়ে অপরা জানেই না যে গলির ভিতরে একটা আধভাঙা বাড়ির একতলায় সোমনাথ নামক একজন যুবক থাকে। তার বাবা স্কুল মাস্টার এবং সে বেকার। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সে একটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লায়েন্সের ছোটো ঘরোয়া কারখানা খুলবে বলে কিছুদিন যাবৎ ঘোরাঘুরি করছে, চোখে তার দেদার স্বপ্ন।

এই সময়ে বজ্রপাতের মতো এই প্রেম।

সোমনাথ একবার ঠিক করল, অপরার চোখে পড়ার জন্য ওর গাড়ির সামনে ঝাঁপ দেবে। কিংবা হিন্দি সিনেমার মতো ওদের পাঁচিলের ওপর উঠে গান গাইবে। কিংবা অপরাপর চোখের সামনে নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে আত্মহত্যা করবে।

শেষ অবধি সে অপরাকে একখানা চিঠি লিখল। খুবই ভদ্র চিঠি এবং বেশ সাহিত্য রসসিক্ত। জবাব পাওয়ার আশা ছিল না, কিন্তু জবাব এল। অপ্রত্যাশিত, একটু কাঁপা কাঁপা ভীরু হাতের লেখা। গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গায় শনিবার বিকেল ছ'টায় সোমনাথকে থাকতে লিখেছে।

নব্য যুবা সোমনাথের একবারও মনেই হল না যে, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে তার বুক ঢিব ঢিব

করতে লাগল। প্রচণ্ড টেনশন। সে কয়েক গ্লাস জল খেল। এবং সারাদিন উড়ু উড়ু মনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল।

যে জায়গাটা নির্দিষ্ট করা ছিল সেটা খিদিরপুর ডকের কাছাকাছি। খুবই নির্জন এবং সন্ধের পর রীতিমতো ভয়াবহ জায়গা। এ জায়গাটা সোমনাথের সম্পূর্ণ অচেনা। এরকম একটা জায়গা অপরা কেন বেছে নিল তা সোমনাথ বুঝতে পারল না।

সোমনাথের পুঁজি খুবই সামান্য। সে দুটো টিউশনি করে তাই দিয়ে মাসের খরচটা চালিয়ে নেয়। বিড়ি সিগারেগ বা সিনেমা থিয়েটার দেখার নেশা নেই বলে তার চলে যায়। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের বই কেনা তার একমাত্র নেশা, তাই সামান্য হাত খরচের টাকা থেকেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা চিন্তা করল। কেন না জায়গাটায় পৌঁছোনোর কোনো বাসরুট নেই।

এসপ্ল্যানেডে অনেকগুলো ট্যাক্সিকে পর পর ধরার চেষ্টা করল সোমনাথ। কিন্তু জায়গাটার নাম শুনে সব ট্যাক্সিওয়ালাই হয় আঁতকে ওঠে, না হয় তো কঠোরভাবে মাথা নেড়ে চলে যায়।

এদিকে শীতের সন্ধে দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। ছ'টা বাজতে খুব বেশী দেরী নেই।

সোমনাথ অগত্যা ময়দানের দিকে এগিয়ে গেল। যদি খিদিরপুর-গামী কোনো শেয়ারের ট্যাক্সিও ধরতে পারে।

সন্ধের পর ময়দানও এক ভুতুড়ে ছন্নছাড়া জায়গা। কুয়াশা এবং ধোঁয়াশায় গোটা তেপান্তরের মাঠটাই আবছা এবং রহস্যময়। সোমনাথ হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ছিল। তার বোধহয় উচিত ছিল বেলাবেলি গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা।

সোমনাথ আচমকাই একটা প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু পরিচিত শব্দ শুনতে পেল। ঘোড়ার গাড়ির মৃদু ঝুমঝুমির আওয়াজ। সেই সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের কপ কপ শব্দ। একটা ছ্যাকরা গাড়ি বেশ দ্রুত দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথ মরিয়া হয়ে ভাবছিল, ঘোড়ার গাড়িটাই ভাড়া করবে

কি না। অবশ্য ঘোড়ার গাড়িতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানোর কোনো আশাই নেই। তবু একটা চেষ্টা তো···

বাতাসে শপাং করে একটা চাবুকের শব্দ হল, তারপরেই কুয়াশার ভিতর থেকে ঘোড়ার গাড়িটার আবির্ভাব ঘটল।

সোমনাথ হাত তোলেনি বা ডাকেওনি। কিন্তু গাড়িটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। কোচোয়ান কোচবক্স থেকে একটু ঝুঁকে তাকে জিজ্ঞেস করল, খিদিরপুর যাবেন নাকি বাবু?

সোমনাথ ভারী অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ যাবো, কিন্তু আমার ছ'টার মধ্যে পৌঁছনো দরকার।

কোট গলাবন্ধ আর টুপিতে লোকটা একেবারে ঝুববুস হয়ে বসে আছে। হাতে বিড়ি বা সিগারেট কিছু একটা জ্বলছে। সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, কোনো চিন্তা নেই, পৌঁছে দেবো। আমার ঘোড়া হল পক্ষিরাজ, উঠে পড়ুন।

সোমনাথ আতঙ্কিত গলায় বলল, কত নেবে?

লোকটা একটু ভেবে বলল, এক টাকা।

এক টাকা? এ যে অবিশ্বাস্য কম ভাড়া?

কিন্তু সোমনাথের নষ্ট করার মতো সময় নেই, সাড়ে পাঁচটা বেজে সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসল।

ঘোড়ার গাড়িতে সে আগে কখনোই ওঠেনি। কলকাতার লুপ্তপ্রায় ঘোড়ার গাড়ির অবশিষ্ট দু'একটিকে সে কদাচিৎ রাস্তায় দেখেছে। জরাজীর্ণ, অস্তিত্বলোপের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

কিন্তু গাড়ির ভিতরে বসে অন্ধকারেও সোমনাথ যা অনুভব করল তা বিস্ময়কর। প্রথম কথা ভিতরে বাইরের মতো শীত নেই। বেশ কবোষ্ণ আবহাওয়া। কোনো কটু গন্ধ নেই। বরং ভারী স্নিগ্ধ একটা সুবাস রয়েছে। গাড়ির গদি এত নরম এবং মসৃণ যে, খুব দামী মোটরগাড়িতেও বোধহয় এরকমটি নেই।

গাড়ি যে চলতে শুরু করেছে তাও বুঝতে পারছিল না সোমনাথ। কারণ কোনো ঝাঁকুনি লাগল না, দুলুনি টের পাওয়া গেল না। শুধু

বাইরের দিকে চেয়ে অপস্রিয়মান রাস্তা আর গাছপালা দেখে সে বুঝল, গাড়িটা চলছে।

কিন্তু কিরকম গতিবেগে চলছে? একটা ঘোড়া কত জোরে ছুটতে পারে? গাড়িটা চলা দেখে মনে হচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ ষাট মাইল বা তারও বেশী গতিতে গাড়িটা যাচ্ছে। অথচ ঘোড়ার পায়ের শব্দ বা চাবুকের আওয়াজ সোমনাথের কানে এল না। একটু বাদে সে টের পেল, গাড়ির গতি দ্বিগুণ বেড়েছে, অথচ কোনো শব্দই নেই।

এসব কী হচ্ছে? এরকম তো হওয়ার কথা নয়?

সোমনাথ হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল, কোচোয়ান?

যেন একটা স্পিকারের ভিতর দিয়ে ধাতব স্বর এল, জী! কিছু বলছেন?

গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে কেন?

আপনাকে যে ছটার মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে সাহেব।

কিন্তু ঘোড়া কি এত জোরে দৌড়ায়?

আমার ঘোড়া যে পক্ষিরাজ সাহেব।

নির্দিষ্ট জায়গায় যখন গাড়িটা এসে দাঁড়াল তখন সোমনাথের ঘড়িতে পাঁচটা চৌত্রিশ হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র চার মিনিটে এসপ্লানেড থেকে খিদিরপুরে পৌঁছে গেছে সে।

মানসিক উত্তেজনার জন্য সোমনাথ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। কোচোয়ানকে একটা টাকা দিয়ে সে গিয়ে ঘাটের কাছাকাছি দাঁড়াল।

কোচোয়ানটা গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াকে শুকনো ঘাসজাতীয় কিছু খাওয়াচ্ছিল, সোমনাথের দিকে চেয়ে বলল, সাহেব কি ফিরে যাবেন? দেরী আছে। কেন বলো তো?

আমি পৌঁছে দিতে পারি।

সভয়ে সোমনাথ জিজ্ঞেস করল, কত ভাড়া নেবে?

এক টাকা। আমি কখনো এক টাকার বেশী ভাড়া নিই না।

সোমনাথ একটু ইতস্তত করছে দেখে কোচোয়ান নিজেই বলল, এখান থেকে ফেরার কোনো গাড়ি নেই সাহেব।

ঠিক আছে, তবে দাঁড়াও।

গঙ্গার ধারে একটা বাঁধানো চত্বর। একটু দূরের একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে যে ক্ষীণ আলো আসছে তাতে যতদূর দেখা যায় জায়গাটা ফাঁকা। কোন লোকবসতি নেই, রাস্তা দিয়ে এক আধটা গাড়ি খুব জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনো পদাতিক দেখা যাচ্ছে না।

সোমনাথ ঘড়ির দিকে চেয়ে বার বার ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। অপরা এরকম একটা জায়গা কেন বেছে নিল সেটা বারবার ভেবেও বুঝতে পারছিল না।

যখন ছটায় এসে ঘড়ির দুটো কাঁটা একটা সরলরেখায় পরিণত হল তখন হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে সোমনাথের কাছেই থেমে গেল। গাড়িটা কালো একটা পন্টিয়াক। ঠিক এরকম গাড়ি অপরাদের নেই।

সোমনাথের বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। সে গাড়িটার দিকে খুব লাজুক ও ভীরু পায়ে এগিয়ে গেল।

কিন্তু গাড়িটার কাছ বরাবর পৌঁছোতেই সে দেখতে পেল, গাড়ির মধ্যে অপরা নয়, তিন চারজন পুরুষ বসে আছে।

সোমনাথ ফের পিছিয়ে আসছিল, হঠাৎ গাড়ির পিছনের দরজা খুলে একটা বিশাল চেহারার লোক নেমে এল।

সোমনাথ কিছু বুঝে উঠবার আগেই লোকটা হাত বাড়িয়ে তার সোয়েটারের বুকটা খামচে ধরে বলল, কতদিন হল মেয়েটার পিছু নিয়েছো ?

আজ্ঞে ? সোমনাথ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

লোকটা অন্য হাতে সোমনাথের গালে বিশাল একটা থাপ্পড় বসিয়ে বলল, প্রেমরোগ কী করে সারাতে হয় আমরা জানি, বামুন হয়ে চাঁদে হাত ?

সোমনাথ জীবনে কখনো মারধর খায়নি, মারপিটও করেনি। চড় খেয়ে সে এমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল যে মুখে কথা সরল না।

গাড়ি থেকে আরও তিনজন নেমে এল। এদের কাউকেই সোমনাথ কখনো দেখেনি।

চারজন যখন ঘিরে ধরল সোমনাথকে তখনও সে বুঝতে পারছিল না, কোথায় কোন গণ্ডগোল সে পাকিয়ে বসে আছে। অপরাকে চিঠি লিখেছিল, অপরা তার জবাব দিয়েছে, তবে কী হল?

কিন্তু এরপর যা ঘটল তা সোমনাথের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। চারটে লোক তাকে ঠেসে ধরল। একজন একটা ক্ষুর বের করে চটপট তার মাথাটা কামিয়ে ফেলল। তারপর তার জামাকাপড় টেনে হিঁচড়ে এবং ছিঁড়ে গা থেকে খুলে ফেলল। শুধু আণ্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় সে শীতে ভয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বাক্যহারা হয়ে কাঁপতে লাগল।

তারপর দুটো লোক দুদিক থেকে পর্যায়ক্রমে তার মুখে ঘুঁষি মারতে লাগল। প্রচণ্ড ঘুঁষি। তার ঠোঁট ফেটে গেল, চোখ ফেটে গেল গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল নগ্ন বুকে। সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

তবু বুঝতে পারল না ভুলটা কোথায় হয়েছে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে সে শুধু জিজ্ঞেস করতে পেরেছিল, চিঠিটা কি অপরা লিখেছিল আমাকে? নিজে?

সে তো তোর মতো গাড়ল নয়।

পেটে একটা লাথি খেয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সোমনাথ।

একটু দূর থেকে কোচোয়ানটা নির্বিকার চোখে দৃশ্যটা দেখল।

চারটে লোক গাড়িতে উঠে সাঁ করে চলে যাওয়ার পর কোচোয়ানটা তার ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করে ধীর পায়ে সোমনাথের সংজ্ঞাহীন শরীরটার কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপর জিব দিয়ে একটা চুকচুক শব্দ করল।

সাহেব। ও সাহেব।

সোমনাথ নিথর।

কোচোয়ান নিচু হয়ে সোমনাথের শরীররটা পাঁজাকোলে তুলে ফেলে শিস দিল। ঘোড়াটা চটপঠ গাড়িসমেত এগিয়ে এল কাছে।

. সোমনাথকে গাড়িতে তুলে সীটের ওপর শুইয়ে দিল কোচোয়ান। তারপর কোচবক্সে উঠে চাবুকটা একবার আপসে নিয়ে বলল, চল রে পক্ষিরাজ।

ঘোড়াটা একটা লাফ দিল। তারপর গাড়িসমেত হঠাৎ মিলিয়ে গেল বাতাসে।

॥ দুই ॥

সোমনাথের যখন জ্ঞান ফিরল তখনও চারদিক অন্ধকার। সে ঘোড়ার গাড়ির পিছনের সীটে শুয়ে আছে। গাড়িটা চলছে কি না তা দেখার জন্য সোমনাথ উঠে বসল। বাইরের দিকে চেয়ে যা দেখল তাতে তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে এক প্রচণ্ড তুষার ঝড় চলেছে, চারদিক শুধু সাদা বরফে ঢাকা। আকাশ মেঘলা এবং কালো।

কোচোয়ান! কোচোয়ান!

সেই ধাতব কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল, আপনার সামনের সীটে যে পোশাকটা রাখা আছে সেটা পরে নিন সাহেব, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।

হতভম্ব সোমনাথ বলল, কিন্তু এ আমাকে তুমি কোথায় এনেছো? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

পোশাকটা পরে নিন সাহেব।

সোমনাথ কিছুক্ষণ অসহায় ভাবে বসে রইল। সে যে স্বপ্ন দেখছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বপ্নই যদি হবে তাহলে একটু আগে সে যে মার খেয়েছিল তার ব্যথা কেন এখনো সর্বাঙ্গে থাবা গেড়ে আছে? পেটে ব্যথা, চোয়াল ফুলো ঝুলে পড়েছে, রক্ত শুকিয়ে আছে তার খোলা বুকে, নাক ফুলে ঢোল, ঠোঁট কেটে গেছে। জীবনে এত মার খায়নি কখনো সে। এত ব্যথা নিয়ে নিশ্চয়ই সে ঘুমোচ্ছে না! তাহলে স্বপ্ন দেখবে কি ভাবে?

তাহলে সে কি মরে গেছে ? এ কি মৃত্যুর পরেরকার জগৎ ?

সোমনাথ এইসব সমস্যায় ভীষণ বিব্রত বোধ করতে করতে সামনের সীট থেকে পোশাকটা তুলে নিল। পাতলা সাদা একটা জোব্বার মতো জিনিস। এ পোশাক পরলে কি বাইরের ওই শীত সহ্য করা যায় !

গাড়ির ভিতরে অবশ্য শীতের আভাসও নেই। সোমনাথ পোশাকটা পরার চেষ্টা করতে লাগল, তার পরনে আণ্ডারওয়ার ছাড়া কিছুই নেই।

জোব্বাটা পরে নিতে অবশ্য তেমন অসুবিধে হল না। জামার সঙ্গে পায়জামার মিলন ঘটলে যা হয়। কল কারখানার শ্রমিকরা যেমন ওভারল পরে অনেকটা তেমনি তবে এই পোশাকটায় আবার জুতো দস্তানা এবং মুখঢাকা টুপিও লাগানো আছে। কাপড়টা কী ধরনের তা বুঝতে পারল না সোমনাথ। ভিতরটা মসৃণ আর নরম, বাইরেটা খসখসে। জুতোর নিচে একটা পাতলা সোল আছে। পোশাকটার কোনো ওজন নেই। এত হাল্কা যে গায়ে কিছু আছে বলেই মনে হল না।

গাড়ির ডান দিককার দরজাটা খুব আস্তে খুলে গেল এবং সেই ধাতব কণ্ঠ বলল, নামুন সাহেব।

সোমনাথ নামল। বাস্তবিকই এক তুষারঝড় তার চারদিকে বয়ে চলেছে। সে কলকাতার ছেলে। তুষারপাত বড় একটা দেখার সুযোগ হয়নি। একবার সান্দাক ফু ট্রেকিং করতে গিয়ে, আর একবার সিমলায় একটা টেবিল টেনিস টুর্নামেণ্ট খেলতে গিয়ে তুষারপাত দেখেছিল। কিন্তু এ যেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। এটা তো শুধু তুষারপাত নয় তুষারের প্রচণ্ড এক ঝড়। বাতাসের ঝাপটায় সোমনাথ দাঁড়াতেই পারছিল না। তবে যতটা শীত করার কথা ততটা শীত সে টের পাচ্ছে না, ঠাণ্ডা লাগছে বটে, তবে তা অসহনীয় নয়।

গাড়ির মাথায় তাকিয়ে সে কোচবক্সে কোচোয়ানকে দেখতে পেল

না। চারদিকে তাকিয়ে দেখল অনন্ত এক তুষাররাজ্য। কোথাও আর কিছু নেই।

কোচোয়ান! কোচোয়ান!

কানের কাছে একটা ধাতব কণ্ঠস্বর বলে উঠল, ভয় নেই সাহেব, নাক বরাবর ঠিক দশ পা হেঁটে যান।

সোমনাথ আতঙ্কিত পায়ে ঠিক দশ পা হাঁটল, তারপর দাঁড়াল।

এবার?

পায়েব নিচে কত ফুট ঘন বরফ জমে আছে কে জানে। কিন্তু সোমনাথ সবিস্ময়ে দেখল জমাট বরফের চাঙড় ভেঙে একটা কিছু উঠে আসছে তার সামনে। প্রথমে সরু শীর্ষদেশ, তারপর ধীরে ধীরে একটা ছোট্ট কালো পিরামিড দেখা দিল।

এগিয়ে যান সাহেব। দরজা খুলে যাবে।

সোমনাথ দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে যেতেই পিরামিডের একটা দেওয়াল হঠাৎ দুভাগ হয়ে দুধারে সরে গেল। সামান্য একটু ফাঁক, সোমনাথ ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই তার পিছনে দরজাটা ফের বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে প্রশস্ত একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। ভারী সুন্দর একটা নক্সাদার কার্পেটের মতো জিনিস পাতা, আর সে জিনিসটা নিজেই একটা নরম স্বচ্ছ আলো বিকীর্ণ করছে। দেওয়ালগুলিও তাই। সব কিছুর ভিতর থেকেই যেন আলোর আভা বেরিয়ে আসছে।

শরীরের প্রচণ্ড ব্যাথা আবার টের পাচ্ছিল সোমনাথ।

তাকে আর কোন কণ্ঠস্বর নির্দেশ দিচ্ছে না। সে কি এখন নামবে সিঁড়ি বেয়ে?

সোমনাথ সিঁড়িতে পা দিতেই মসৃণ গতিতে সিঁড়িটা নামতে লাগল। এসকালেটর, তবে এসকালেটর এক জায়গায় শেষ হয় এবং খাঁজে ঢুকে যায়, কিন্তু এ সিঁড়িটা সেরকম নয়। অনন্ত গতিতে সোমনাথকে টেনে নিয়ে চলেছে। এবং সে গতি ঘণ্টায় অন্তত ত্রিশ মাইল। খানিক নেমে সিঁড়িটা সোজা গেল, তারপর বাঁয়ে বেকল, ডাইনে বেঁকল। মিনিট খানেক বাদে এক জায়গায় থামল।

একটা প্রশস্ত হলঘর। সোমনাথ বুঝল এখানে তাকে নামতে হবে। সিঁড়ির সঙ্গে লাগানো ঘরটার মেঝে। সেটাও কার্পেটে মোড়া এবং আলোকিত।

সোমনাথ চারদিকে চেয়ে আলোর উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা করল, পারল না। ঘরটারও কোনো ডিজাইন সে বুঝতে পারল না, খুব উঁচু এবং মস্ত এক হলঘর, সেটার কোনো দিক সোজা, কোনো দিক আঁকাবাঁকা, কোনো দিক ঢেউ খেলানো।

সোমনাথ ধীরে ধীরে কয়েক পা এগোতেই একটা চাকা লাগানো ধাতব খাট এগিয়ে এল, মোটোরাইজড এবং নেপথ্য চালিত, খাটের ওপর একটা বিছানা রয়েছে। এবং খাটের সঙ্গে লাগানো রয়েছে নানারকম টাইপ এবং অদ্ভুত যন্ত্র।

কে যেন বলল, শুয়ে পড়ুন।

সোমনাথ—ক্লান্ত, ব্যথাতুর, ভীত, বিস্মিত সোমনাথ আর দ্বিধা করল না। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। সে সবসময়ে বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করে বলে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রের স্বপ্ন দেখে। এটাও এরকম একটা স্বপ্নই হবে।

দ্বিতীয়বার সোমনাথের ঘুম ভাঙলে সে দেখল তার বুকের ওপর অতিকায় টেলিফোনের মতো একটা যন্ত্র, আর শরীরের নানা জায়গায় প্যাড আর নল লাগানো। শরীরে আর কোনো ব্যথা টের পাচ্ছিল না সে। বেশ তরতাজা আর ঝরঝরে লাগছে নিজেকে।

তবু এটা যে স্বপ্নই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সোমনাথ স্বপ্নটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই ফের চোখ বুজল।

সাহেব, ও সাহেব।

সোমনাথ চোখ মেলল, একজন কালো মতন মানুষ তার ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে।

কোচোয়ান না?

জী সাহেব। এখন কেমন আছেন?

এই জনশূন্য পুরীতে এই প্রথম একজন মানুষকে দেখে সোমনাথ ভারী খুশি হয়ে বলল ভাল। কিন্তু আমি কোথায় ?

কোচোয়ান সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, বর্বররা খুব ঠেঙিয়েছিল আপনাকে।

মারের কথা মনে পড়ায় সোমনাথ দাঁতে দাঁত পিষল।

আমি কি জেগে আছি কোচোয়ান ?

জেগে আছেন সাহেব।

আমি কোথায় কোচোয়ান ?

হাসপাতালে।

এটা কোন হাসপাতাল ? আমি এরকম হাসপালাল কখনো দেখিনি তো !

এটার নাম পুনর্জীবন কেন্দ্র তিন।

এরকম নামও তো শুনিনি কোন হাসপাতালের।

আপনার আমলে এরকম নামের কোনো হাসপাতাল যে ছিল না। আপনি দেড় হাজার বছর এগিয়ে এসেছেন সাহেব।

সোমনাথ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বুঝল, সে এখনো স্বপ্ন দেখছে, তাই চোখ বুজে ফেলল।

কোচোয়ান শব্দ করে হেসে বলল, চোখ বুজে কোনো লাভ নেই সাহেব। আপনি স্বপ্ন দেখছেন না, আপনি জেগে আছেন এবং চারিদিকে যা দেখছেন সবই সত্য।

টাইম মেশিনের কথা কল্প বিজ্ঞানে পড়েছে সোমনাথ। কিন্তু সেটা তো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। হলে ভাল হত। কিন্তু হওয়া কি সম্ভব ?

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সোমনাথ।

আমি কোথায় কোচোয়ান ?

আপনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন, খিদিরপুর, গঙ্গার ঘাট মনে পড়ে ?

পড়ে কোচোয়ান।

আপনি সেখানেই আছেন, তবে সময়টা আর সেখানে নেই।

টাইম মেশিন ?

কোচোয়ান গম্ভীর হয়ে বলল, মেশিন তো মানুষেরই তৈরি সাহেব, মানুষই বানায়।

তা বটে।

তাহলে মেশিন-মেশিন করে আপনাদের গলা শুকোয় কেন ?

সোমনাথ চারদিকে চেয়ে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, আমি উঠতে পারি ?

উঠুন সাহেব। আপনি এখন ভাল আছেন। একটু অপেক্ষা করুন, আমি যন্ত্রগুলো খুলে নেই।

লোকটা অত্যন্ত পটু হাতে যন্ত্রগুলোকে সরিয়ে দিল, তারপর বলল, এবার উঠুন।

সোমনাথ উঠল, শরীরে বিন্দুমাত্র ব্যথা নেই। কিন্তু মাথাটা যে ওরা কামিয়ে দিয়েছিল।

যেন মনের কথা টের পেয়েই কোচোয়ান বলল, মাথাটা ন্যাড়াই থাকছে সাহেব। একটা সলিউশন লাগানো হয়েছে। সাত দিনে চুল বড় হয়ে যাবে।

সাত দিন! ততদিন কি আমি এখানে থাকব ?

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, না সাহেব। আপনার ইচ্ছে না হলে থাকবেন না। অন্য কোনো সময় থেকে কাউকে আনার নিয়মও নেই। আমি আপনাকে এনে ফেলেছি নিতান্তই দায়ে পড়ে। ফেলে এলে আপনি মরে যেতেন, ওরা আপনার হাল খারাপ করে দিয়েছিল।

আপনার সেই গাড়িটাই কি তাহলে টাইম মেশিন ?

টাইম মেশিন নিজে নিজে চলে না সাহেব, তাকে চালাতে হয়।

লোকটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই খানিকটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সোমনাথ, মেশিনের প্রশংসা করলে লোকটা খুশি হয় না। লোকটা বিনয়ী হলেও ব্যক্তিত্ববান। লোকটা হয়তো একজন মস্ত

বৈজ্ঞানিক। সে বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা কত সাল বলবেন?

তিন হাজার পাঁচশো একান্ন।

সোমনাথ ফের চোখ বুজল, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল তার।

চোখ খুলুন সাহেব। আপনার কোনো ভয় নেই। আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবেন? দেড় হাজার বছর পরেকার কলকাতার চেহারাটা একটু দেখব!

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, সব হবে সাহেব। তবে অন্য যুগের মানুষকে স্বাধীনভাবে আমরা ঘুরতে দিই না।

কেন?

আবহাওয়ার তফাত আর টাইম ল্যাগ। দুটোই মারাত্মক, বাইরে গেলেই আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

তাহলে আপনি কি করে উনিশ শো সাতাশিতে গিয়েছিলেন?

আমার রক্ষাকবচ আছে। আপনার নেই।

পৃথিবীর আবহাওয়া এখন কেমন?

খুব ঠাণ্ডা, হিমযুগ আসছে। আপনি তো একটু দেখেছেন।

কলকাতায় তাহলে সত্যিই বরফ পড়ে?

পড়ে সাহেব। খুব বেশীই পড়ে।

আমি কি আর কিছুই দেখতে পাবো না?

কলকাতায় কি আগের কিছুই নেই?

দেড় হাজার বছর বেশ লম্বা সময় সাহেব। তবে একেবারেই যে কিছু নেই তা বলব না। কিছু আছে, কিছু নেই। ওরকম তো হতেই পারে। আর একটা কথা সাহেব, আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। আমি আপনার চেয়ে অন্তত দেড় হাজার বছরের ছোটো।

সোমনাথ একটু হেসে বলল, তা বটে, তবে—

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, তবে টবে নয় সাহেব, তুমি করেই বলবেন।

সোমনাথ কয়েক পা হাঁটল। ওইরকম মারাত্মক মার খাওয়ার পর

মাত্র ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এত সুস্থ বোধ করাটাই অস্বাভাবিক। সোমনাথের ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে সাতটা।

সোমনাথ এবার কোচোয়ানের দিকে চেয়ে বলল, আপনি আমাকে এযুগে নিয়ে এলেন কেন?

কোচোয়ানকে যেন একটু চিন্তিত দেখাল, সে অনেকক্ষণ সোমনাথের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কারণ আছে সাহেব। গভীর কারণ।

কী সেই কারণ?

কোচোয়ান কিছু বলার আগেই কোনো লুকোনো স্পিকার থেকে টরে টক্কার মতো মৃদু কিছু সংকেত বেজে উঠল।

কোচোয়ান বলল, আসছে।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলে, কে আসছে?

কোচোয়ান কোনো জবাব দিল না। চারজন লোক ঘরে এসে দাঁড়াল সোমনাথের মুখোমুখি। চারজনই গম্ভীর। সোমনাথ লক্ষ করল, এদের প্রত্যেকের পরনেই জোব্বা জাতীয় পোশাক। যেমনটা তারও পরনে রয়েছে। এ যুগের এটাই কি একমাত্র পোশাক?

চারজনের একজন, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে হাতজোড় করে বলল, নমস্কার সোমনাথবাবু। চল্লিশ শতকের অভিনন্দন।

এমন নাটুকে অভ্যর্থনায় সোমনাথের হাসি পাচ্ছিল। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর থেকে সে বলল নমস্কার, ধন্যবাদ। আপনারা কারা?

মহাশয়, আমরা আপনাদেরই সন্তান সন্ততি, আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

লোকটা কেমন যেন সাজিয়ে কথা বলছে, অনভ্যস্ত ভঙ্গি।

সোমনাথ বলল, আপনারা কি এভাবেই কথা বলেন?

লোকটা মাথা নাড়ল, না, ভাষা এক পরিবর্তনশীল মাধ্যম। আমাদের ভাষা অন্যরকম। আমি প্রাচীন বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছি। আমার নাম র।

আপনাদের ভাষা কেমন?

সংকেতময় এবং শব্দ নির্ভর। আপনাদের মতো আমরা বাক্য

রচনা করি না। একটি বাক্যকে বীজাকারে একটি শব্দে প্রকাশ করি। আবার একটি শব্দ উচ্চারণ করলে একাধিক বাক্য প্রকাশ হয়।

লোকটি যখন কথা বলছে তখন অন্য তিনজনও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। কেমন যেন গুব গুব, টুংটাং, খস খস সব অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছিল নিম্নস্বরে।

সোমনাথ কবিতা পড়তে ভীষণ ভালবাসে। সে প্রশ্ন করল, এখন কি আর কবিতা লেখা হয় না?

লোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, হয়। আমাদের যন্ত্রগণকেরা লেখে।

যন্ত্রগণক?

আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশয়। কিন্তু আমাদের হাতে আর বিশেষ সময় নেই। অস্তিত্বের অতীব সংকট দেখা দেওয়ায় আমরা আপনাকে সময়ের বহতা ধারায় অনেক দূরে এনে ফেলেছি। আমাদের ক্ষমা করুন। অনেক হিসাব নিকাশ করে দেখেছি আপনাকে চার ঘণ্টার বেশী আটকে রাখলে সমূহ সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। হয়তো বা মানবজাতির ইতিহাসই বদলে যাবে।

সোমনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

মহাশয়, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস ছকে বাঁধা। যা ঘটে গিয়েছে সেগুলিরই পরিণতি বর্তমান। আমরা সময়ের উজানে যেতে পারি। আমরা ইচ্ছা করলে অতীতের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনও করতে পারি। কিন্তু তার ফলাফল সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকতে হয়। সামান্যমাত্র ভুলচুক করলেও পরবর্তী ঘটনাবলী সাঙ্ঘাতিক ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মহাশয়, আমরা কিছুকাল আগে একবিংশ শতকের একটি শিশুকে মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম, সেই শিশু পরে এক মারক রশ্মি দিয়ে পৃথিবীর সমূহ জীবন নাশ করতে উদ্যত হয়।

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, আপনারা কী করলেন?

আমরা আবার একবিংশ শতকে ফিরে গিয়ে শিশুটির জীবন নাশের

ব্যবস্থা করি। আপাতদৃষ্টিতে কাজটা নিষ্ঠুর কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদের এই কাজ করতে হয়েছিল। সুতরাং আমরা আর ভবিতব্য নিয়ে খেলা করি না, ঈশ্বর মঙ্গলময়।

আপনারা কি ঈশ্বর মানেন ?

অবশ্যই মহাশয়, ঈশ্বর এক প্রমাণিত সত্য।

আচ্ছা, ভূত বলে কি কিছু আছে '

আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, ভূতও এক প্রমাণিত সত্য। কিন্তু আমাদের আর সময় নেই। যদি দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে একটু আসেন। আমাদের গ্রাম প্রধান আপনার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা বলবেন।

গ্রাম প্রধান ?

সোমনাথেব ফের হাসি পেল। গ্রাম কোথায় যে গ্রাম প্রধান থাকবে ? তবে সে কোনো মন্তব্য করল না। শুধু বলল চলুন।

ঘরের বাইরে একটি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ 'পথ'। চারদিকে নরম আলো। এবং সে আলো আসছে দেওয়াল মেঝে এবং ছাদ যে বস্তুতে তৈরি তারই অভ্যন্তর থেকে। সামনেই একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার ছাদ নেই, চাকা নেই, লম্বা একটা চুরুটের মতো তাব চেহারা। খোঁদলের মধ্যে কয়েকটা আসন।

বিনীতভাবে র বলল, দয়া করে আগে আপনি উঠুন।

তারা সকলেই গাড়িতে উঠল। শুধু কোচোয়ান বযে গেল। গাড়িটা চলতে শুরু করল। কোনো ঝাঁকুনি নেই, দুলুনি নেই, বাতাসে অস্বস্তিকর ঝাপটা নেই। অথচ গতি প্রচণ্ড।

এটা কীরকম গাড়ি।

র বিনীতভাবে বলল, এক একটি ত্রিচর যান। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চলতে পারে। আপনাদের আমলের মোটরগাড়িরই আধুনিক সংস্করণ। যে কারিগরির দ্বারা এটি তৈরি হয়েছে সেটি আপনাদের যুগে অজ্ঞাত ছিল। বললেও হয়তো আপনি সঠিক অনুধাবন করতে পারবেন না।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, এরকমই হওয়ার কথা। আমাদের আমলের কল্পবিজ্ঞানে আমরা এরকম যানের কথা পড়েছি।

আজ্ঞে যথার্থই বলেছেন। সেইসব কল্পনার মধ্যেই সম্ভাব্যতার বীজ ছিল। আমরা আপনাদের কাছে ঋণী।

আপনারা মাটির নীচেই থাকেন বুঝি?

না মহাশয়। মাটির উপরিভাগেও আমাদের নানা নির্মাণ আছে। তবে পৃথিবীর উপরিভাগে তাপমাত্রা কোথাও কোথাও শূন্যের একশ ডিগ্রিরও নিচে নেমে গেছে। তাই আমাদের সাধারণ মানুষেরা মাটির নিচেই বসত করে থাকে।

চাষবাস হয় না?

হয় মহাশয়, দেখবেন?

হ্যাঁ।

র একটা শব্দ উচ্চারণ করল। শোনাল অনেকটা, ক্রুৎ।

গাড়িটা থেমে গেল। র তার আঙুলের ফাঁকে লুকোনো একটা চৌকো জিনিস শুধু একবার উল্টে দিতেই ডান দিকে ও বাঁ দিকের দুটি দেয়াল হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে গেল। দেখা গেল দু ধারেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর ক্ষেতের মতো নয়। বেগুনী একটা আলোর আভায় দেখা গেল, মাটির নিচে প্রায় বনভূমি তৈরি করেছে এরা। তার মাঝখানে সবুজ বা হলুদ শস্যে ছাওয়া ক্ষেত।

ওগুলো কিসের ক্ষেত?

ধান, গম ভুট্টা, বার্লি, ডাল। ঋতুচক্র একরকম নেই বলে এখন আমরা সব ঋতুতেই সব রকম চাষ করে থাকি। সামনে আমাদের গোশালাও দেখতে পাবেন। কুকুর, হাঁস, মুরগি, বাঘ, ভালুক সবই আমরা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছি।

ওপরে কোন গাছ জন্মায় না?

জন্মায়। শুধু দুটি মেরু অঞ্চলে তাপমান কিছু বেশী বলে কিছু গাছপালা জন্মায়। তবে সেগুলিও তুষারযুগের গাছ, তাদের প্রজাতি ভিন্ন। মেরু অঞ্চলে অনেক মানুষও উপরিভাগে বসবাস করে।

গোশালা, অরণ্য অঞ্চল, পোলট্রি সবই দেখতে পেল সোমনাথ। মাটির নিচে এ এক আশ্চর্য জগৎ। বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গাড়িটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল। একটু বাদেই একটা সুড়ঙ্গ বেয়ে সেটা উঠে এল মাটির ওপরে।

বাইরে এখনো তুষারঝড় বয়ে চলেছে। চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু গাড়িটা যেখানে নামল সেটা একটা গ্রামই বটে। গাড়ির ভিতরে একটা সুইচ টিপে স্নিগ্ধ আলোয় চারদিক ভরে দিল। সেই আলোয় দেখা গেল, পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছবির মতো সাজানো কুটির, খড়ের গাদা, চণ্ডীমণ্ডপ, গোচারণ ক্ষেত্র। আশ্চর্য। আশ্চর্য! এখানে গাছপালাও রয়েছে। বাঁশবনে জোনাকি জ্বলছে। শেয়াল ডাকছে। পায়ের নীচে ঘাস, তৃণ, চোরকাঁটা।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, এসব কি সত্যি?

সত্য মহাশয়। একে বলা হয় তাপ বিকীরণ ক্ষেত্র। তবে এরকম মুক্তাঞ্চল বেশী নেই। তৈরি করা অনেক শ্রমসাপেক্ষ এবং আমাদের শক্তির ভাণ্ডার ততখানি সমৃদ্ধ নয়। শুধু গ্রাম-প্রধানদের জন্যই পৃথিবীতে এরকম গোটা কয়েক গ্রাম আমরা তৈরি করেছি। আসুন, সামনের ওই আটচালাটিতেই গ্রাম-প্রধান থাকেন।

সোমনাথ অবাক হয়ে দেখল, আটচালাতে ঢোকার মুখে দাওয়ার খুঁটি বেয়ে লাউডগা লতিয়ে উঠেছে চালে। লাউও ফলে আছে মেলা। এ দৃশ্য এ যুগে দেখবে বলে কল্পনা করেনি সে।

ঘরের ভিতরকার দৃশ্যটি আরও বিস্ময়কর। একটি জলচৌকির ওপর মোটা একখানা পুঁথি খুলে এক বৃদ্ধ প্রদীপের আলোয় কিছু পড়ছেন।

সোমনাথ ঢুকতেই বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন পিতা। আমাদের কী সৌভাগ্য!

প্রথমটায় বৃদ্ধের প্রণামে সোমনাথ তটস্থ হয়ে উঠলেও পর মুহূর্তেই তার মনে পড়ল, সে এই বৃদ্ধের চেয়ে বয়সে অন্তত দেড় হাজার বছরের বড়।

সামনেই তার জন্য আসন পাতা রয়েছে। সোমনাথ বসবার পর বৃদ্ধ উপবেশন করলেন। অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে পিতা।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, মোটেই না। বিকেল ছটার সময় আমাকে চারজন গুণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। আপনারা আমাকে তুলে না আনলে আমার নির্ঘাৎ মৃত্যু ঘটত।

বৃদ্ধ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, বর্তমান ইতিহাস অনুযায়ী আপনি সন্ধে সাতটার সময় মারাও গেছেন পিতা। পুরোনো নথিতে দেখাও যাচ্ছে সাতুই জানুয়ারি আপনার মৃত্যু ঘটে গেছে। কিন্তু আমরা তা ঘটতে দিতে পারিনা।

সোমনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ হাতের পুঁথিটি সোমনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন পিতা, এটি হল সেই বছরের কলকাতা করপোরেশনের মৃত্যুর নথি-বই। ডেথ রেজিস্টার।

সোমনাথ খাতাটা দেখল। স্পষ্টাক্ষরে তার নাম মৃতের তালিকায় লেখা রয়েছে। দেখে তার শরীরটা হিম হয়ে গেল ভয়ে।

বৃদ্ধ সোমনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। অতিশয় মৃদু স্বরে বললেন, আমরা ঘটে যাওয়া ঘটনার সংশোধন সাধারণত করি না। তার ফল মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে বিকল্প ইতিহাস সৃষ্টি করা ছাড়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

সোমনাথের গলা বুজে গিয়েছিল। ভাল করে স্বর ফুটছিল না। সে গলা খাঁকারি দিয়ে একটু কাঁপা স্বরে বলল, কেন ?

আমাদের শক্তির উৎস সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশ কঠিন বরফের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। এটা হিম যুগের প্রাথমিক স্তর। এরপর ক্রমে আরও ঠাণ্ডা আসবে। সূর্যকে বছরের পর বছর দেখাই যাবে না। আকাশ সর্বদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। আমাদের শক্তির উৎস এমন নয়, যা দিয়ে আমরা এই প্রখর হিমযুগের সঙ্গে অবিরল লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। আমাদের অসহায় অবস্থা কি আপনি বুঝতে পারছেন পিতা ?

পারছি। বলুন।

কিন্তু আমরা কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারি না। আমরা হঠাৎ করে কিছু আবিষ্কারও করে ফেলতে পারি না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা ঘটে ক্রমবিবর্তনের পরিণতিতেই। আমরা যথেষ্ট হিসাব নিকাশ করেছি, যন্ত্রগণকরাও দিনরাত্রি পরিশ্রম করেছে। আমরা একটি পরীক্ষামূলক বিকল্প ইতিহাসও তৈরি করে দেখেছি। আমরা কী দেখেছি, জানেন পিতা ?

না।

বিংশ শতকের শেষ বছরে একজন শিশুর জন্ম সম্ভব। তার নাম হবে সোমসুন্দর। ধীমান এই শিশু পরবর্তীকালে পৃথিবীর নিঃশেষিত দাহ্য পদার্থের বিকল্প এক শক্তি আবিষ্কার করতে পারে। তাহলে একবিংশ শতক থেকে সেই শক্তির উৎস ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের হাতে আসবে পিতা। এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আমরা এই হিমযুগকে অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারব।

বুঝেছি। কিন্তু আমার কি করার আছে?

সোমসুন্দরের পিতা ও মাতার নাম আপনাকে এখনো বলিনি পিতা।

কী তাদের নাম।

সোমসুন্দরের পিতার নাম সোমনাথ রায়, মাতার নাম অপরা মিত্র। দুজনেই কুলীন কায়স্থ। দুজনেই বিজ্ঞান-মনস্ক। বিকল্প ইতিহাস অন্তত তাই বলছে।

সোমনাথ আবার চমকে উঠল, বুকটা ধক ধক করতে লাগল, কিছুক্ষণ পরেই আবার বিমর্ষতায় ভরে গেল মন।

সোমনাথ বলল, তা তো আর সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ একটু হাসলেন, হ্যাঁ পিতা, স্বাভাবিক ঘটনা অনুযায়ী সম্ভব নয়। আমরা তা জানি। কিন্তু আমরা এই ইতিহাসকে মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু পরিবর্তিত করতে চাই পিতা।

কী করবেন?

আমরা আপনার শারীরিক বিধানে কিছু পরিবর্তন আনব। তারপর আপনাকে আবার আপনার সময়ে ফিরিয়ে দেব। সন্ধে ছ'টায়, গঙ্গার ঘাটে।

তারপর?

বৃদ্ধ একটু হাসলেন, ইতিহাসটা অন্যরকম ভাবে লেখা হবে।

অপরা আমাকে চেনেনা।

জানি পিতা।

আমি তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তারপর—

জানি পিতা। তবে এবার ঘটনা অন্যভাবে ঘটবে।

আমার শারীরিক বিধানে আপনারা কী পরিবর্তন আনবেন?

বৃদ্ধ অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, এ যুগের বিজ্ঞান অতিশয় সূক্ষ্ম! সব কথা হয়তো আপনি বুঝবেন না। আপনি অনুমতি করলে আমরা আর আপনার সময় নেবো না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আর বিশেষ সময় আমাদের হাতে নেই।

বৃদ্ধ উঠে সোমনাথকে প্রণাম করলেন।

র এগিয়ে এসে বলল, আসুন পিতা, যানে আরোহণ করুন।

সোমনাথ নীরবে গাড়িতে উঠল। যতক্ষণ গাড়িটা চলল ততক্ষণ সোমনাথ সম্মোহিতের মতো বসে রইল। ইতিহাস অন্যরকম করে লেখা হবে! কি রকম করে? অপরা। অপরার সঙ্গে তার···! যাঃ, অসম্ভব।

একটা গম্বুজওয়ালা ভূগর্ভস্থ ঘরে তাকে নিয়ে এল র এবং তার সঙ্গীরা। একটা চমৎকার বিছানায় সোমনাথ শুয়ে পড়ল। তারপর একটা প্রকাণ্ড ঢাকনায় ঢাকা পড়ে গেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন

গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ। অদূরে সেই ঘোড়ার গাড়ি। কোচোয়ানে বিচালি খাওয়াচ্ছে। ল্যাম্পপোস্ট থেকে মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ছে নির্জন ভুতুড়ে জায়গাটায়।

শপাং করে চাবুকের একটা শব্দ হল।

সোমনাথ চমকে চেয়ে দেখল, গাড়িটা এসেছে। সে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাস পাল্টে দিতে হবে।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল সামনে। একজন লোক নেমে এল। বিশাল চেহারা। এসেই সোজা সোমনাথের বুকের কাছে সোয়েটারটা খামচে ধরে বলল, কতদিন হল মেয়েটার পিছু নিয়েছো?

হঠাৎ সোমনাথ এক তীব্র ইচ্ছাশক্তিকে টের পেল। এই সেই মুহূর্ত। সোমনাথ ডান হাতটা তুলে তীব্র এক ঘুঁষি মারল লোকটার মুখে।

দানবটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

আরও তিনজন নেমে এল। কিন্তু সোমনাথ পিছিয়ে গেল না। এগিয়ে গেল।

শপাং করে চাবুকটার আর একটা শব্দ হল। দেড় হাজার বছর পরেকার পৃথিবী যেন আনন্দের অভিনন্দন পাঠাচ্ছে তাকে।

জীবনে মারপিট করেনি সোমনাথ। কিন্তু তার তীব্র ঘুঁষি আর লাথির চোটে তিন তিনটে লোক গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

সোমনাথ দেখল আরোহীহীন গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। প্রতিপক্ষ ভূলুণ্ঠিত।

শপাং করে চাবুকের আর একটা শব্দ হল। সোমনাথ তাকাতেই কোচোয়ান মোটরগাড়িটা দেখিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ গাড়িসমেত কোচোয়ান অদৃশ্য হয়ে গেল বাতাসে।

সোমনাথ ধীর পায়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিল। সে জীবনে গাড়ি চালাতে শেখেনি কখনো! কিন্তু আজ অনায়াসে চালাতে লাগল।

অপরার জন্য আর কোনো মাথাব্যথা ছিল না সোমনাথের। দুশ্চিন্তাও নয়। সে জানে, তার অলক্ষ্যে ইতিহাস অন্য ভাবে রচিত হচ্ছে।

গাড়িটা বড় রাস্তায় পরিত্যাগ করে সে গলির মধ্যে তার বাড়িতে যখন ফিরে এল তখন মাত্র রাত সাড়ে নটা।

এই ঘটনার তিনদিন বাদে একদিন অপরা তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কুকুরকে ব্যায়াম করাতে। শীতের সুন্দর সকালে সে হঠাৎ একটি যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ভাবল, আহা এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত!

এই ঘটনার তিন বছর বাদে সোমনাথ তার শিশুপুত্র সোমসুন্দরকে প্র্যামে চড়িয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল। এখন তার অবস্থা যথেষ্ট ভাল। সায়েন্টিফিক অ্যাপ্ল্যায়েন্সের ব্যবসা রে রে করে চলছে।

পাড়া ছেড়ে একটা নির্জন মাঠের ধারে এসে পড়েছিল সোমনাথ।

আচমকা একটা ঘোড়ার গাড়ির ঝুমঝুম শব্দ বেজে উঠল।

সোমনাথ চমকে তাকাল।

সাহেব, কোথাও যাবেন? পৌঁছে দেবো?

সোমনাথ একটু হাসল, কেমন আছো কোচোয়ান?

খুব ভাল সাহেব।

সব ভাল ?

সব ভাল। ইতিহাস বদলে গেছে। চলি সাহেব।

কোচোয়ান হাত তুলল। ঘোড়াটা একটা লাফ দিল শূন্যে। তারপর মিলিয়ে গেল।

সোমনাথ হাতটা তুলে রইল। মুখে স্মিত হাসি। হাসিমুখেই শিশুপুত্রের ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকাল সে।

ইতিহাস বদলে গেছে।
